যুগে যুগে

দাওয়াতী দ্বীনের কাজে

মহিলাদের অবদান

মাসুদা সুলতানা রুমী

যুগে যুগে দাওয়াতী দ্বীনের কাজে মহিলাদের অবদান

মাসুদা সুলতানা রুমী

প্রকাশনায়
বদ্বীপ প্রকাশনী
১৭১ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন-০১৭১১৫৮১২৫৫

যুগে যুগে দাওয়াতী দ্বীনের কাজে মহিলাদের অবদান
মাসুদা সুলতানা রুমী

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০০৭

প্রকাশক
তৌহিদুর রহমান
বদ্বীপ প্রকাশনী

যোগাযোগ
বদ্বীপ প্রকাশনী
১৭১, বড় মগবাজার
(ডাক্তারের গলি) ঢাকা-১২১৭
ফোন: ০১৭১ ৫৮১২৫৫, ০১৯১৬৫৮৭৪২৮

প্রচ্ছদ
গোলাম সাকলায়েন

মুদ্রক
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

দাম
২০.০০ (কুড়ি টাকা) মাত্র

ISBN-984-817-017-0

প্রাপ্তিস্থান

❖ প্রফেসর বুক কর্নার, তাসনিয়া বই বিতান, প্রীতি প্রকাশন, আহসান পাবলিকেশন- ওয়্যারলেস রেলগেট, বড় মগবাজার, ঢাকা।

❖ আহসান পাবলিকেশন-কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা।

❖ আহসান পাবলিকেশন- কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা।

❖ মহানগর প্রকাশনী ও তামান্না পাবলিকেশন, ৪৮ পুরানা পল্টন, ঢাকা।

❖ আজাদ বুকস্ ও তাজ লাইব্রেরী, আন্দর কেল্লা, চট্টগ্রাম।

যুগে যুগে দাওয়াতী দ্বীনের কাজে মহিলাদের অবদান

ইতিহাস সাক্ষী, গোবী মরুভূমি থেকে উঠে আসা দুর্ধর্ষ বর্বর মঙ্গোল জাতি ইসলাম গ্রহণ করেছে মুসলিম নারীদের দাওয়াত ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। চেংগিস খানের নাতী হালাকু খান যখন বাগদাদ আক্রমণ করে তখন বাগদাদের খলিফা ও আমীর-ওমরা ছিল আরাম-আয়েশ ও অবৈধ ভোগ-বিলাসে লিপ্ত। এমন সময় ঝড়ের তাণ্ডব নিয়ে নাযিল হয় হালাকু খান। বাগদাদের ওপর বয়ে যায় প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা। বিশ লাখ মানুষের মধ্যে চার লাখ কোনোমতে জান নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়। দজলার পানি রক্তে রঙিন হয়ে যায়। পাঠাগার, মাদ্রাসা, বাড়ি-ঘর সব আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। বছরের পর বছর ধরে যারা শিয়া-সুন্নী নিয়ে বিতর্ক করে একে অপরকে কাফের বানাতে ব্যস্ত ছিল সেই ওমরা ও ওলামাদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। খিলাফতে আব্বাসিয়ার শেষ বংশধরকে সহজভাবে হত্যা না করে হাতির পায়ের তলায় পিষ্ট করা হয়। তারপর হালাকু খান ফিরে যাওয়ার আগে দজলা নদীর বাঁধ ভেঙে দিয়ে যায়। সাথে করে নিয়ে যায় অজস্র ধন-সম্পদ, হিরা-জহরত আর বাগদাদের কয়েক সহস্র অপূর্ব সুন্দরী মুসলিম নারী। এই নারীরা ইসলামের অবক্ষয়ের মধ্যে লালিত-পালিত হলেও ইসলামের শিক্ষা থেকে তখনো একেবারে দূরে সরে যায়নি। তাই তো তারা শীলাদেবীদের মতো আত্মহত্যার পথ বেছে না নিয়ে সবর করেছে এবং হেকমতের সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছে। তাদের প্রচেষ্টায় মূলত মাত্র বিশ বছরের ব্যবধানে গোটা মঙ্গোল জাতি ইসলামের দাওয়াত পায়। ইসলাম গ্রহণ করে চেংগিস খানের পরবর্তী বংশধররা। যে চেংগিস খান বলত, 'তোমরা আল্লাহর গযবকে ভয় করো, তাই না? আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর গযব হয়ে এসেছি।' এই মঙ্গোলদেরই পরবর্তী মুসলিম রূপ মোঘল বংশ।

দায়ী ইল্লাল্লাহর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নারীরা সব যুগেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। আজকের নারী সমাজের মধ্যেও সেই উদ্দীপনা সেই জযবার কমতি নেই। কিন্তু আছে কিছু সীমাবদ্ধতা আর জ্ঞানের স্বল্পতা যা দূর করার একটাই রাস্তা তা হলো, আল কুরআন, আল হাদীস, ইসলামী সাহিত্য ও ইতিহাস বেশি বেশি করে অধ্যয়ন করা। এর কোনো বিকল্প নেই।

মহান আল্লাহর প্রথম নির্দেশ, 'ইকরা বিসমি রব্বিকাল্লাজি খলাক্ব অর্থাৎ পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।'

মহান আল্লাহর এই আদেশের নাম হচ্ছে ফরজ। এই ফরজকে যে অমান্য করে তাকে বলা হয় ফাসেক আর অস্বীকার করলে বলা হয় কাফের। অতএব, 'লেখাপড়া করা, জ্ঞান অর্জন করা হচ্ছে ফরজ। রসূল স. বলেন, 'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ।' ইসলামকে বুঝতে হলে পড়তে হবে।

না, আমি বি.এ. এম.এ. কিংবা আলেম, কামেল পাসের কথা বলছি না। আমি বলছি

এই পরিমাণ পড়াশুনার কথা যার মাধ্যমে আল কুরআনের মৌলিক পরিভাষাগুলো আমরা যেন বুঝতে পারি। ইসলাম ও জাহেলিয়াতের পার্থক্য বুঝতে পারি। ইবাদাত ও বেদাতের পার্থক্য বুঝতে পারি। আমার ও আমার মালিক মহান আল্লাহর সাথে আমার সম্পর্ক কি তা জানতে পারি। আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য জানতে পারি, দ্বীন সম্পর্কে সঠিক ধারণা নিতে পারি। যুগে যুগে নারীরা দায়ী-ইল্লাল্লাহর দায়িত্ব কিভাবে পালন করেছেন সেই জগৎ সম্পর্কে জানতে পারি। আর বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলিম নারীদের সঠিক দায়িত্ব ও কর্তব্য কি তাও যেন বুঝতে পারি।

দ্বীন ও দাওয়াত শব্দের অর্থ

দাওয়াতে দ্বীনের কাজে নারী কতখানি অবদান রেখেছিল এবং রাখছে তা জানতে হলে আগে আমাদের দাওয়াতে দ্বীন সম্পর্কে সঠিক ধারণা নিতে হবে।

দাওয়াত শব্দের অর্থ আহ্বান করা, ডাকা, আবেদন করা, নিমন্ত্রণ করা ইত্যাদি। আর দ্বীন শব্দটির অর্থ ব্যাপক। দ্বীন কুরআন মজীদের একটি বিশেষ পরিভাষা। স্থান ও পাত্র ভেদে কুরআন পাকে এ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন মাথা শব্দটি বাক্য ভেদে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যখন বলা হয়, 'মাথা ব্যথা করছে' তখন মাথা বলতে দেহের একটি অঙ্গকে বোঝায়। যখন বলি, 'সে তো বাড়ির মাথা' তখন মাথা বলতে বাড়ির কর্তা বোঝায়। যখন বলি, 'সে যা-ই করুক তোমার এতো মাথা ব্যথা কিসের?' এখানে মাথা ব্যথা বলতে বোঝানো হচ্ছে প্রয়োজন। যদি বলা হয়, 'ছেলের কাজে বাপের মাথা মাটিতে মিশে গেল' তখন বোঝা যায় অপমানিত হওয়া। এমনিভাবে মাথা শব্দটি বাক্য ভেদে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। ঠিক তেমনি দ্বীন শব্দটি আল কুরআন হাদীস ও আরবী সাহিত্যে চারটি অর্থ বহন করে।

১. প্রভুত্ব, প্রতিপত্তি, আধিপত্য বা কর্তৃত্ব—কোন ক্ষমতাসীনের পক্ষ থেকে। ২. বন্দেগী বা দাসত্ব ও আনুগত্য—ক্ষমতাসীনের সামনে মাথা নতকারীর পক্ষ থেকে। ৩. নিময়-নীতি, আইন-কানুন, বিধি-বিধান। ৪.ফায়সালা, প্রতিফল, পরিণাম, প্রতিদান ইত্যাদি।

কুরআন মজিদে বিভিন্নভাবে দ্বীন শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়

১ম ও ২য় অর্থে দ্বীন শব্দটি সূরা আল বাইয়েনার পাঁচ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'দ্বীনকে একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেছ করা ছাড়া তাদেরকে অন্য কিছুর নির্দেশ দেওয়া হয়নি।'

১. এখন এসব লোক কি আল্লাহর আনুগত্য করার পন্থা (আল্লাহর দ্বীন) পরিত্যাগ করে অন্য কোন পন্থা গ্রহণ করতে চায়? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিস ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, আল্লাহর নির্দেশের অধীন (মুসলিম) হয়ে আছে আর মূলত তাঁর দিকেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে।' (সূরা আল ইমরানের ৮৩)

২. .... এবং একান্তভাবে তাঁরই দ্বীন সমগ্র সৃষ্টিলোকে চলছে। অত:পর আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা কার প্রতি তাকওয়া পোষণ করবে?' (নাহল-৫২)

৩. হে নবী! এই কিতাব আমি তোমার প্রতি পরম সত্যতা সহকারে নাযিল করেছি। অতএব, তুমি এক আল্লাহরই বন্দেগী কর, দ্বীনকে কেবল তাঁরই জন্য খাঁটি করে নাও। সাবধান! খাঁটি দ্বীন তো একমাত্র আল্লাহরই হক। আর যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে আর বলে, আমরা তো এদের ইবাদত করি কেবল এজন্য যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে দেবে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের মাঝে সেসব কথারই চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেবেন যে সব বিষয়ে তারা মতভেদ করছে। আল্লাহ মিথ্যাবাদী ও সত্য অমান্যকারী ব্যক্তিকে কখনও হেদায়েত দান করেন না। (সূরা যুমার-২,৩)

৪. হে নবী! তাদেরকে বল, আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, দ্বীনকে আল্লাহর জন্য খাঁটি ও নিষ্ঠাপূর্ণ করে নিয়ে আমি তাঁরই বন্দেগী করব। আর আমাকে হুকুম করা হয়েছে যে, সকলের আগে আমি নিজে মুসলিম হব। বল, আমি যদি আমার রবের নাফরমানি করি তাহলে আমার বড় এক আযাবের ভয় রয়েছে। বলে দাও, আমি তো নিজের দ্বীনকে আল্লাহর জন্য খাঁটি করে তাঁরই ইবাদাত করব। (সূরা যুমার -১১, ১৪)

৫. তিনি চিরঞ্জীব। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নাই। তোমরা তাঁকেই ডাক, নিজেদের দ্বীনকে তাঁরই জন্য খালেস ও নিষ্ঠাপূর্ণ করে নাও। সব প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য। (সূরা মুমেন-৬৫)

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং সে ক্ষমতা স্বীকার করে তাঁর দাসত্ব, আনুগত্য কবুল করার অর্থে দ্বীন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহর জন্য দ্বীনকে খালেস করার অর্থ মানুষ আর কারো আনুগত্য. সার্বভৌমত্ব, কর্তৃত্ব স্বীকার করবে না এবং অন্য কাউকে অংশীদারও করবে না।

দ্বীন শব্দের বিভিন্ন অর্থ

১. মহান আল্লাহ বলেন, 'শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কারো নয়। তাঁরই নির্দেশ তিনি ছাড়া আর কারো বন্দেগী করো না। এটাই সত্য ও সঠিক দ্বীন।' (সূরা ইউসুফ ৪০)

২. হে নবী! বল, হে লোকেরা, তোমরা যদি আমার দ্বীন সম্পর্কে এখনও কোনরূপ সন্দেহের মধ্যে থাকো তা হলে শুনে রাখ. তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর যাদের দাসত্ব করো আমি তাদের দাসত্ব করি না, বরং কেবল সেই খোদারই বন্দেগী ও দাসত্ব করি, তোমাদের জীবন ও মৃত্যু যাঁর মুষ্টিতে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যারা ঈমান এনেছে আমি তাদের একজন হব।' (সূরা ইউনুস-১০৪)

৩. 'অতএব, (হে নবী ও নবীর অনুসরণকারী লোকেরা) একমুখী হয়ে নিজেদের সমগ্র লক্ষ্য এই দ্বীনের দিকে কেন্দ্রীভূত করে দাও। দাঁড়িয়ে যাও সেই প্রকৃতির ওপর যার ওপর মহান আল্লাহ মানুষকে পয়দা করেছেন। আল্লাহর বানানো কাঠামো বদলানো যেতে পারে না। এটাই সর্বতোভাবে সত্য নির্ভুল দ্বীন। কিন্তু অনেক লোকেই তা জানে না।' (সূরা রুম-৩০)

৪. 'ব্যভিচারী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ উভয়ের প্রত্যেককেই একশটি বেত মার। আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া-অনুকম্পার ভাবধারা যেন তোমাদের মনে না জাগে, যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। আর তাদেরকে শাস্তি দানের সময় ঈমানদার লোকদের একটি দল যেন উপস্থিত থাকে।' (সূরা নূর-২)

'এবং এমনিভাবে তাদের শরীকেরা বহু সংখ্যক মুশরিকের জন্য তাদের নিজেদের সন্তানকে হত্যা করার কাজকে খুবই আকর্ষণীয় বানিয়ে দিয়েছে যেন তারা তাদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত করে এবং তাদের নিকট তাদের দ্বীনকে সন্দেহপূর্ণ বানিয়ে দেয়। আল্লাহ চাইলে তারা এরূপ করত না। কাজেই তাদের ছেড়ে দাও, তারা নিজেদের মিথ্যা রচনায় নিমগ্ন থাকুক।' (সূরা আনআম-১৩৭)

আবার বলা হয়েছে, 'এরা কি আল্লাহর এমন কিছু শরীক বানিয়ে নিয়েছে যারা তাদের জন্য দ্বীনের নতুন কোন নিয়ম-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যার কোন অনুমতি আল্লাহ দেননি। (সূরা শুয়ারা-২১)

সূরা কাফেরুনের ৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আর আমার জন্য আমার দ্বীন।'

উপরোক্ত ঐসব আয়াতে দ্বীনের অর্থ আইন, বিধান, নিয়ম-কানুন, শরীয়ত, জীবন ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রভৃতি বোঝায়।

চতুর্থ অর্থে দ্বীন অর্থ প্রতিফল, প্রতিদান, বদলা। যেমন সূরা ফাতিহায় বলা হয়েছে, 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' 'প্রতিদান দিবসের একমাত্র মালিক'।

বলা হয়েছে, 'তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছ যে পরকালের শুভ প্রতিফল ও শাস্তিকে অবিশ্বাস করে।' (সূরা মাউন-১) 'আবার বলছি, তুমি কি জানো সেই বিচারের দিনটি কি? এটি সেই দিন যখন কারো জন্য কিছু করার সাধ্য কারো থাকবে না। সেদিন ফয়সালার চূড়ান্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর এখতিয়ারেই থাকবে।' (সূরা ইনফিতর-১৮,১৯)

ইসলামী আইন বা জীবন বিধান

'কর্মের প্রতিফল অবশ্য অবশ্যই হবে।' (যারিয়াহ-৬)

এসব আয়াতে দ্বীন শব্দটি হিসাব-নিকাশ, ফায়সালা, প্রতিদান ও কর্মফল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে আইন বা জীবন বিধান হিসাবে।

'তিনিই তো নিজের রসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন যেন তাকে প্রচলিত সর্বপ্রকারের দ্বীনের ওপর বিজয়ী করে দেন তা মুশরিকদের পক্ষে সহ্য করা যতই কঠিন হোক না কেন।' (সূরা সফ-৯, সূরা ফাতহ, সূরা তওবা)

দ্বীন শব্দের সবক'টি অর্থের দিকে গুরুত্ব দিয়ে সেদিকে মানুষকে আহ্বান করার নাম দাওয়াতে দ্বীন। দ্বীনের সংজ্ঞা যেমন ব্যাপক, দাওয়াতে দ্বীনের পরিধিও তেমনি ব্যাপক। এই দ্বীনের নাম ইসলাম আর এই ইসলামই আমাদের দ্বীন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে মনোনীত করলাম।' (সূরা মায়েদাহ-৩)

আর এ ইসলামের দিকে আহ্বানকারী বা দাওয়াত দানকারী হিসাবে মহান আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রসূলদের পাঠিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে নবী, আমি তোমাকে সত্য সাক্ষী ও সুসংবাদদাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী, আল্লাহর নির্দেশে তাঁর দিকে আহ্বানকারী হিসাবে এবং একটি উজ্জ্বল প্রদীপ হিসাবে প্রেরণ করেছি।' (আহজাব-৪৫,৪৬)
সূরা যারিয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি দুনিয়াতে আমার প্রতিনিধি পাঠাচ্ছি।' (যারিয়াহ -৫৬)

ইবাদাত কি?

খলিফা বা প্রতিনিধির দায়িত্বই হলো ইবাদত বা দাসত্ব করা। আর এই কর্মসূচী তিনি প্রেরণ করেছেন নবী-রসূলদের মাধ্যমে। তাই শেষ নবী মোহাম্মাদ স. যে কাজ যেভাবে করার নির্দেশ দিয়েছেন, যে কাজ যেভাবে করে দেখিয়ে গেছেন, সেই কাজ সেভাবে করার নাম ইবাদাত। নিজেদের মনগড়া কোন কাজ যত সুন্দর আর কল্যাণকরই মনে হোক না কেন, তা কখনও ইবাদাত হতে পারে না। ইবাদাতের উপরোক্ত সংজ্ঞা সামনে রেখে আমাদের খতিয়ে দেখা দরকার আমাদের কর্তব্য কী? নবী-রসূলদের প্রথম ও প্রধান কাজই ছিল আল্লাহর এ দ্বীনের দাওয়াত দুনিয়ার সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এই দাওয়াত পৌঁছে দিতে গিয়ে সকল যুগের নবী-রসূলদের মত সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, আমাদের প্রিয়তম নবী অকথ্য নির্যাতনের নির্মম শিকার হয়েছেন এবং যাঁরাই তার দাওয়াতে সাড়া দিয়ে এই দ্বীনকে গ্রহণ করেছেন তারাই মনেপ্রাণে বুঝে নিয়েছেন, এই দাওয়াতের কাজই জীবনের একমাত্র ব্রত।
জুলুম, নির্যাতন, সম্পদের ক্ষতি, জীবনের হুমকি কোন কিছুই তাদেরকে বিরত রাখতে পারেনি। যখনই কোন ব্যক্তি ইসলামকে গ্রহণ করেছে, মুসলিম নামে পরিচিত হয়েছে, তখনই সে বুঝে নিয়েছে তার পরবর্তী দায়িত্ব। এ দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে অপরের কাছে, সে নারী পুরুষ যেই হোক না কেন। চোখ বন্ধ করে একটু ভেবে দেখুন তো, জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত বিশ্ব! একজন মাত্র মানুষ আলোর সন্ধান পেয়েছেন, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছেন, 'হে আবৃত শয্যা গ্রহণকারি। ওঠ, সাবধান কর এবং তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্বের ঘোষণা কর।' (সূরা আল মুদ্দাস্সির-১,৩) মানুষটি উঠে দাঁড়ালেন, অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষদের সাবধান করলেন, মহান রবের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিলেন। ঘরে ঘরে, জনে জনে, একজন একজন করে সে দাওয়াতে সাড়া দিতে লাগলেন। প্রথমে জীবন সাথী, তারপর গৃহে লালিত-পালিত দু'টি কিশোর-যুবক ছেলে, অতঃপর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ধীরে ধীরে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হতে লাগল ঐ দাওয়াত। তিন বছরের গোপন দাওয়াতে ১৩৩ জন মুসলমান হন। এরপর শুরু হয় প্রকাশ্য দাওয়াত। আর আজকের বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন। সেই দাওয়াতেরই ফলশ্রুতিতে আপনি মুসলমান, আমি মুসলমান। এই ধারা যাতে অব্যাহত থাকে কিয়ামত পর্যন্ত সেই ব্যবস্থায় আল্লাহ ও রসূল স. করেছেন। রসূল স. বিদায় হজ্বের সময় বলেন, 'তোমরা যারা এখানে উপস্থিত আছ তারা এ দাওয়াত পৌঁছে দেবে তাদের কাছে যারা এখানে উপস্থিত.

নেই...।' এ নির্দেশের ফলে এ দায়িত্ব আপনার আমার সবার ওপরে। কেউ আমরা এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে পারি না। এই দাওয়াত দানের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করাই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাত বা দাসত্ব।

বর্তমান পেক্ষাপটে দাওয়াতে দ্বীনকে সহজ ও সুস্পষ্টভাবে পেশ করতে হলে তিনটি দফায় পেশ করা যায়:

১. সাধারণত সকল মানুষকে, বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করার আহ্বান জানানো।

২. যারাই ইসলামকে মেনে নেওয়ার দাবী করে তাদেরকে এই আহ্বান জানানো যে, তারা যেন তাদের বাস্তব জীবন থেকে মুনাফেকী ও কর্মবৈষম্য দূর করে খাঁটি মুসলমান হতে এবং ইসলামের পূর্ণ আদর্শে আদর্শবান হতে প্রস্তুত হন।

৩. মানব জীবনের যে ব্যবস্থায় আজ বাতিলপন্থীদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব চলছে, আমাদের দাওয়াত হবে এই নেতৃত্বের আমূল পরিবর্তন করে আল্লাহর নেক বান্দাদের হাতে কর্তৃত্ব সোপর্দ করার জন্য সকল মুসলমানকে আহ্বান জানানো।

দাওয়াতে দ্বীনের প্রথম দফা

সকল মানুষকে, বিশেষ করে মুসলমানদেরকে আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করার আহ্বান জানানো। অতএব, আমাদের প্রথম বুঝতে ও বোঝাতে হবে আল্লাহর দাসত্বের সঠিক অর্থ কি? প্রথমেই বলা হয়েছে, রসূল স. যে কাজ যেভাবে করেছেন বা করার নির্দেশ দিয়েছেন তাকেই বলে ইবাদাত। যেমন নামায—ইবাদাত এতে কারো কোন প্রকার দ্বিমত নেই। কিন্তু কেউ যদি বলে, ফজরের আজানের পর অনেকটা সময় পাওয়া যায় ঐ সময় দশ রাকাত নামায পড়ব আর যোহরের সময় আমি খুবই ব্যস্ত থাকি— ঐ সময় পড়ব দুই রাকাত। এই নামায কি ইবাদাত হবে? আমাদের একটা ছোট বাচ্চাও বোঝে, এভাবে নামায আদায় করলে ইবাদাত হবে না। রসূল স. যখন যেভাবে যে কয় রাকাত নামায পড়তে বলেছেন সেভাবে সেই কয় রাকাত নামায আদায় করার নামই ইবাদাত। শুধু নামাযের ব্যাপারেই নয়, শেষ নবী স.-এর সুন্নাহর মাধ্যমে জানতে পারি, তা হলো, মানুষ আল্লাহকে পূর্ণরূপে ইলাহ, রব, মাবুদ, শাসক, মনিব, মালিক, পথ প্রদর্শক, আইন রচিয়তা, হিসাব গ্রহণকারী, প্রতিফলদাতারূপে মানবে এবং নিজের সমগ্র জীবনকে ব্যক্তিগত, সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এক কথায় তার সমগ্র দিক একমাত্র আল্লাহর দাসত্বের ভিত্তিতেই গড়ে তুলবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন, 'পূর্ণরূপে ইসলামের মধ্যে দাখিল হও।' জীবনের কোন একটি দিককেও আল্লাহর আনুগত্যের বাইরে রাখা যাবে না।

দাওয়াতে দ্বীনের দ্বিতীয় দফা

যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে তারা যেন বাস্তব জীবনে মুনাফেকীর নীতি বর্জন করেন। ইসলামের বিপরীত চিন্তা কাজ ও অভ্যাস বর্জন করেন। আল কুরআনে

মহান আল্লাহ্ বলেন, 'ওয়াদখুলু ফিস্ সিলমি কাফ্ফাত ওতাত্তাবিয়ু খুতুওয়াতিশ শাইতান।' 'তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না।' অর্থাৎ ইসলামের বিপরীত অন্য কোন পথ মানেই হলো শয়তানের দেখানো পথ। ঈমান আনার পর যারা শয়তানের দেখানো পথে চলে তাদেরকেই বলে মুনাফিক। কোন কাফের মুশরিক মুনাফিক হয় না। মূলত মুসলমানরা যদি ঈমান অনুযায়ী কাজ না করে তবে তারাই মুনাফিক। এই মুনাফিকদের সম্পর্কেই মহান আল্লাহ বলেন, 'মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে' (সূরা আন নিসা-১৪৫)। অতএব, প্রত্যেক মুমীনের কাছে আমাদের দাওয়াত হলো প্রত্যেক মুমীন তার জীবন ও কর্ম যেন ইসলামের রঙে রঞ্জিত করে। তার জীবনের প্রতিটি বিষয় ও বিভাগ যেন আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যের মধ্যে নিয়ে আসে।

দাওয়াতে দ্বীনের তৃতীয় দফা

নেতৃত্বের আমূল পরিবর্তন। নেতৃত্বের পরিবর্তন না হলে সমাজের পরিবর্তন হতে পারে না। ব্যক্তিরও পরিবর্তন সম্ভব নয়। কোন ব্যক্তি যদি পুরোপুরি ঈমানের পথে চলতে চায় তবে তার সামাজিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক পরিবেশ যদি ইসলামী পরিবেশ না হয় অর্থাৎ মানব জীবন যাপনের সকল দিক ও বিভাগ যদি ইসলামের বিপরীত ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত হয় সেখানে শত চেষ্টা করেও পুরোপুরি ইসলামী জিন্দেগী অনুসরণ করে চলা সম্ভব নয়। আর এটা প্রমাণের জন্য বেশী দূরে যেতে হবে না। আমাদের দেশই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দেশের নেতা বা পরিচালক যদি অসৎ, পাপাচারী, খোদাদ্রোহী হয়, শয়তানের অনুগত লোকেরা দুনিয়ার নেতা ও প্রশাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় আর যতদিন জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-শিল্পকলা, শিক্ষা-দীক্ষা, প্রচার-প্রকাশনা, আইন প্রণয়ন ও আইন প্রয়োগ, অর্থনীতি, শিল্প, প্রযুক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য, অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এসব কিছু তাদের হাতে থাকবে ততদিন সে মুমিন মুসলমানের পক্ষে নিজের জীবনে আল্লাহ ও রসূল স.-এর দাসত্ব করা অসম্ভব। শুধু তাই নয়, নিজের পরবর্তী বংশধরদেরও আকিদাগতভাবে ইসলামের অনুসারী বানিয়ে রেখে যাওয়া অসম্ভব।

তাই তৃতীয় পর্যায়ের দাওয়াত হবে যারা প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের দাওয়াত কবুল করল এবং সেই অনুযায়ী মুনাফিকী ত্যাগ করল, তাদেরকে নিজের ও মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য খোদাদ্রোহী অসৎ নেতৃত্ব খতম করে সৎ ও খোদাভীরু নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর দাওয়াত দেওয়া। মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে দলবদ্ধভাবে এ কাজ করতে বলেছেন। 'তোমরা দলবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং নিজেরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।' (আল ইমরান-১০৩)

আল্লাহর রজ্জু অর্থ দ্বীন ইসলাম। দ্বীনকে রজ্জু এই কারণে বলা হয়েছে যে, এই সূত্র দ্বারাই ঈমানদার লোকদের পরস্পর মিলিত করে আল্লাহর বান্দাদের একটি সুসংবদ্ধ দল তৈরি হয়। যারা এই কাজ করবে তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের

মধ্যে এমন কিছু লোক থাকতেই হবে, যারা নেকী ও কল্যাণের দিকে ডাকবে, ভাল ও সত্য কাজের নির্দেশ দেবে এবং পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এই কাজ করবে, তারাই সফলতা পাবে।' (সূরা আল ইমরান-১০৪)
রসূল স. তাঁর সুযোগ্য সাহাবীদের দাওয়াতে এমন একদল জীবন বাজি রাখা জনগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল যাঁদেরকে কুরআনের ভাষায় বলা হয় 'বুনিয়ানুম মারসূস'— সীসা ঢালা প্রাচীর। সীসা ঢালা প্রাচীরের যেমন একটা অংশ থেকে আর একটা অংশ আলাদা করা যায় না তেমনি এই মুমীন জনগোষ্ঠীকেও একজন থেকে আর একজনকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। এদের সম্পর্কে রসূল স. বলেন, 'এদের উদাহরণ মানব দেহের মত। একটা আংগুলে ব্যথা পেলে যেভাবে সারা দেহ টের পায় তেমনি সমাজের কেউ কষ্ট পেলে পুরো সমাজটা যেন সেই কষ্ট অনুভব করে।' সমাজে হৃদ্যতা, সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব, মমত্ব তখনই আসবে যখন গোটা সমাজ আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হবে। সবার অন্তরে আল্লাহভীতি বিরাজ করবে। ভালবাসা ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ একটি সমাজ মহান আল্লাহ চান। তাইতো মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যেন সেই সব লোকের মত না হও যারা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং স্পষ্ট ও প্রকাশ্য নির্দেশ পাওয়ার পরও মতবিরোধে লিপ্ত রয়েছে। যারা এরূপ আচরণ অবলম্বন করেছে তারা সেদিন কঠোর শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে।' (সূরা আল ইমরান-১০৫) আস্তাগফিরুল্লাহ! আল্লাহ পাক আমাদের ক্ষমা করুন। এই স্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়ার পর কি করে আমরা বিভিন্ন দলে ভাগ হই? তাই দ্বীনের দাওয়াত মানে শুধু নামায-রোজা, পর্দা ও পবিত্রতার দাওয়াতই নয়, এই রজ্জুকে মজবুতভাবে ধারণ করার দাওয়াত দিতে হবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ হয়ে গেলে তার কী কঠিন দুর্বিষহ পরিণতি সে কথা প্রত্যেককে বোঝাতে হবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ হওয়া এবং ভাগ করার কাজকে মহান আল্লাহ কুফরী বলে অভিহিত করেছেন। তাদের পরিণতি সম্পর্কে (সূরা আল ইমরানের ১০৬ নম্বর আয়াতে) মহান আল্লাহ বলেন, 'সেদিন কিছু লোকের চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং কিছু লোকের চেহারা কালো হয়ে যাবে। যাদের মুখ কালো হবে তাদেরকে বলা হবে, ঈমানের নেয়ামত পাওয়ার পরও কি কুফরী নীতি অবলম্বন করেছিলে? তাহলে এখন এ কুফরী ও আল্লাহর অকৃতজ্ঞতার পরিবর্তে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো।' এই প্রসঙ্গে রসূল স. বলেন, 'ইসলামী দল থেকে কোন ব্যক্তি যদি এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে যায় সে যেন দ্বীনের রজ্জু তার গলা থেকে খুলে ফেলল। এই অবস্থায় তার যদি মৃত্যু হয়, তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু। জিজ্ঞেস করা হলো, সে যদি নামায পড়ে, রোজা রাখে? রসূল স. বললেন, সে নামায পড়ুক, রোজা রাখুক আর নিজেকে মুসলমান বলে দাবীই করুক— তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের ওপর হবে। আর যদি সে ফিরে আসে তো ভিন্ন কথা।' মুসলিম সমাজ জানে, মুসলমানদের নামায-রোজার পাবন্দ হতে হয়, পর্দা-পুশিদা মেনে চলতে হয়। সামর্থ্য থাকলে হজ্জ-যাকাত আদায় করতে হয়। বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করতে হয়, তারা জানে সুদ-ঘুষ হারাম, মিথ্যা বলা, গীবত-চোগলখুরী করা পাপের কাজ,

খারাপ কাজ। তারা ওজু-গোসল, পাক পবিত্রতাও জানে। ঠিক মতো মানুক চাই না মানুক, এসব তারা জানে। কিন্তু রসূল স.-এর উপরোক্ত দিক নির্দেশনাটি অনেকেই জানে না। সকল প্রকার ইবাদাতের আনুষ্ঠানিক পাবন্দ হয়েও সে যদি ইসলামী দল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, তাহলে তার গলা থেকে যে ইসলামের রজ্জু খুলে যাবে! এই অবস্থায় তার মৃত্যু হলে তার যে জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে এই কথা সে জানে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ হয়ে গেলে তার চেহারা যে আখেরাতে কালো হয়ে যাবে, তাকে যে বলা হবে. শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো। এ কথা অনেকেই জানে না। তাই এই দাওয়াতটা সবার কাছে পৌছে দেওয়া আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য। মহান আল্লাহ বলেন, 'এগুলো তোমার রবের বাণী যা যথাযথভাবে আমি তোমাদের শোনাচ্ছি। কেননা দুনিয়াবাসীদের ওপর জুলুম করার ইচ্ছা তিনি রাখেন না।' (সূরা আলে ইমরান-১০৮) কী চমৎকার কথা! তিনি পরিপূর্ণভাবে সব আদেশ-নিষেধ কুরআনুল করীমের মাধ্যমে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, যাতে মানুষ সঠিক পথ অবলম্বন করতে পারে। কিছুই না জানিয়ে যদি তিনি মানুষকে শাস্তি দিতেন তাহলে তা হতো জুলুম। মহান আল্লাহ মানুষের প্রতি জুলুম করতে চান না। এই দায়িত্ব পুরুষের একার দায়িত্ব নয়। সমাজ যেমন নারী-পুরুষ উভয়কে নিয়ে। তাই এ দায়িত্বও নারী-পুরুষ উভয়ের।

আমাদের দায়িত্ব

আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান ইসলামকে আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা ও সাধনা করার নামই ইসলামী আন্দোলন। আর এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার নাম মুসলমান হওয়া। যখনই কোন ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করবে তখনই তার মনে করতে হবে, সে একটি বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের বিপ্লবী কর্মী। তার ওপর এই মুহূর্তে তিনটি দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে:

১. সুস্পষ্টভাবে ইসলামকে জানতে হবে।
২. সঠিকভাবে ইসলামের আদেশ-নিষেধগুলো মানতে হবে।
৩. অপরের কাছে ইসলামের শিক্ষাকে পৌছে দিতে হবে

এই দায়িত্ব নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলিম দাবীদারের ওপর বর্তায়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, মুসলিম সমাজ এই দায়িত্ব থেকে একেবারেই বিমুখ হয়ে গেছে। নিজে তো পালন করেই না, অপর কেউ করতে চাইলে তাকে বিভিন্নভাবে এ দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে।

১. প্রথম কর্তব্য ইসলামকে জানা। আর জানার তো একটাই প্রধান মাধ্যম আল কুরআন ও হাদীস গ্রন্থসমূহ মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করা। রসূল স. যে কথাটি বলেছেন বিদায় হজ্জের ভাষণে, 'তোমাদের কাছে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, তোমরা যদি এ দু'টি জিনিস আঁকড়ে ধরে থাক তাহলে পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল কুরআন ও আমার সুন্নাহ বা হাদীস।' বিজ্ঞ মুসলিম সমাজ ভেবে দেখুন তো, এ দু'টি জিনিস আমরা আঁকড়ে ধরে আছি কি না। ভেবে দেখুন, আমরা কুরআন-হাদীস থেকে কত

দূরে অবস্থান করছি! কুরআন-হাদীস যখন জানিই না তখন আর মানব কি আর অপরের কাছে পৌছে দেওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার এটাই— মুসলমানরা তাদের প্রথম দায়িত্বটি পালন না করলেও তার পরের দু'টি দায়িত্বই পালন করে অতি নিষ্ঠার সাথে। ইসলামকে না জেনেই তারা মানে! লোক মুখে শুনে বাপ-দাদাদের আমল থেকে চলে আসা নিয়ম-পদ্ধতি ধরে তারা এই শিক্ষাই পৌছে দেয়, যে যেখানে যেভাবে পারে। আর এভাবেই ইসলামের নামে অনৈসলামী কর্মকাণ্ডের বিস্তার ঘটে। ঘরে ঘরে পালিত হয় ইবাদাতের নামে বেদাত, দ্বীনদারীর নামে কুসংস্কার, ইসলামের (আনুগত্যের) নামে আল্লাহদ্রোহিতা, রসূল প্রেমের নামে রসূলের বিরোধিতা। এভাবেই জন্ম নিয়েছে হাজার মত, পথ, ফেতনা, ফ্যাসাদ আর অনৈক্য। জন্ম নিয়েছে রসালো গল্প যার সাথে ইসলামের সামান্যতম সম্পর্কও নেই। অপর দিকে যা কিছু আল কুরআনে আছে, রসূল স.-এর হাদীসে আছে তার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করা হচ্ছে না। ফরয আমলকে দেওয়া হচ্ছে মোবাহের মর্যাদা আর নফলকে দেওয়া হচ্ছে ফরযের মর্যাদা। যে কাজের কথা কুরআন ও হাদীসে নেই তাই অতি গুরুত্বের সাথে সম্পাদন করা হচ্ছে আর যা কিছুর নির্দেশ-উপদেশ আল্লাহ ও তাঁর রসূল স. দিয়েছেন তা তো পালন করা হচ্ছেই না, বরং তার বিরোধিতা করা হচ্ছে। এমন অনেক কথা ও কাজের মধ্যে একটি হচ্ছে, 'মেয়েরা কেন এসব কাজ করবে? নবী-রসূলদের স্ত্রী ও কন্যারা কি এসব কাজ করেছেন?'

বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন পাড়ায় বা মহল্লায় তাফসিরের ক্লাশ, শিক্ষা বৈঠক, তালিম, জামায়াত প্রভৃতি নামে কুরআন-হাদীসের আলোচনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এসব অনুষ্ঠানে আগ্রহী মহিলারা উপস্থিত হন। মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত এ সব বৈঠকে সংক্ষিপ্ত দারস ও আলোচনার মাধ্যমে ইসলামের সঠিক শিক্ষা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। এতে অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ ও আলেম নয় এমন মহিলাদের অনেক পরিবর্তন হচ্ছে। তারা শুদ্ধ করে কুরআন পড়া শিখছে। বিভিন্ন মাসলা-মাসায়েল জানতে পারছে। বিভিন্ন কুসংস্কার ও বেদাতী আমল থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারছে। জানা সত্ত্বেও যে সব ফরজ ওয়াজিব তারা পালন করত না সেই সব কাজের অনুশীলন করছে। অনৈসলামী অভ্যাস, রুচি, চিন্তা-চেতনা ও ভ্রান্তি থেকে নিজেদের পরহেজ করতে পারছে, অথচ সমাজের একদল অতি সচেতন (?) লোকের প্রশ্ন: 'মহিলারা কেন এসব কাজ করবে?'

আফসোস! যারা এই প্রশ্ন করে তারা মহিলাদের কত নিকৃষ্ট মনে করে! মহিলারা সিনেমায় যাবে, যাত্রায় যাবে, থিয়েটারে যাবে, বাজারে যাবে, মেলায় যাবে, বিয়েবাড়ি যাবে, ঝগড়া করবে, গীবত-চোগলখুরী করবে, বেপর্দায় যত্রতত্র ঘুরে বেড়াবে, যা ইচ্ছা তাই করবে— কোন সমস্যা নেই, কারো কোন আপত্তি নেই। শুধু আপত্তি কুরআন-হাদীসের কোন মাহফিলে গেলে। তখনই জায়েজ-নাজায়েজ বৈধ-অবৈধের প্রশ্ন আসে! ধৃষ্টতা আর কাকে বলে? ইবলিশের কাজ কত নিপুণ! মানুষের মধ্যেই অর্থাৎ খোদ মুসলমানদের মধ্যেই ইবলিশ তার কর্মী তৈরি করে ফেলেছে আর তারাই কুরআন

বোঝা ও জানার কাজে মানুষকে বাধা দেয়। যখন একটু অগ্রসর হয়ে কেউ প্রশ্ন করে, রসূল স.-এর সময় মেয়েরা কি এসব কাজ করতেন? রসূল স.-এর স্ত্রী ও কন্যারা কি এ সব কাজ করেছেন? কুরআন-হাদীসে কি মেয়েদের এ সব কাজ করার অনুমতি আছে? ইসলাম সম্পর্কে, ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে, কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে কতখানি অজ্ঞ থাকলে এই প্রশ্ন করা যায়! আসুন, ওপরের প্রশ্নটির উত্তর খুঁজি আমরা কুরআন-হাদীস ও ইতিহাসের পাতা থেকে।

প্রথমেই দেখা যাক. কুরআনে মহান আল্লাহ নারীদের সম্পর্কে কি বলেছেন? 'পুরুষদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে তাই যা সে অর্জন করেছে এবং নারীদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে তাই যা সে অর্জন করেছে।'(সূরা নিসা-৩২)

'মুমিন পুরুষ ও মহিলাগণ পরস্পর বন্ধু ও সহযোগী। তারা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেয় আর অসৎ ও অকল্যাণ থেকে বিরত রাখে। সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। এরা তো এমন লোক যাদের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই রহমত নাযিল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রজ্ঞাময় ও পরাক্রমশালী।' (সূরা আত তাওবা-৭১)

সূরা নিসা ও সূরা তওবার এই আয়াত দু'টি বিশ্লেষণ করলেই পূর্বে উপস্থাপিত সকল প্রশ্নের উত্তর আমরা পেয়ে যাই (যদিও সমার্থবোধক আরও অনেক আয়াত কুরআনে আছে)। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, যা কিছু অর্জন করবে তা তারই। এখানে কোন বৈষম্য নেই। আল্লাহর আনুগত্য করা এবং তাঁর আদেশ মেনে চলা যেমন পুরুষের জন্য জরুরী তেমনি মহিলাদের জন্যও জরুরী। আখেরাতে সফলতা ও বিফলতার বিষয়ে নারী পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মহান আল্লাহ নারীকে দান করেছেন এক স্থায়ী মর্যাদার অধিকার। নারীকে পুরুষের জীবনের পরিপূরক অংশ হিসাবে ইসলাম মনে করে না। তাই নারীর মর্যাদা এরূপ নয় যে, তারা নিজেদের সম্পর্কে কোন চিন্তা না করে শুধু পুরুষের রঙে নিজেদেরকে রাঙিয়ে তুলবে। ঈমান ও আমলের দিক দিয়ে ইসলামের প্রতি নিষ্ঠা ও আনুগত্যের মাপ-কাঠিতে প্রত্যেক নারী ও পুরুষকে তার কাজের জবাবদিহি করতে হবে এবং নিজ নিজ কাজের ফল পেতে হবে।

দ্বিতীয় আয়াতে (সূরা তওবা ৭১ নম্বর আয়াতে) মহান আল্লাহ বলছেন, 'মুমীন নারী ও মুমীন পুরুষ পরস্পরের সমমনা বন্ধু, সহযোগী। তারা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। ...এবং এদের প্রতি অবশ্যই আল্লাহর রহমত নাযিল হবে।' সমাজ, সংসার নারী পুরুষের যৌথ সংগঠন। একজনকে বাদ দিয়ে একজনকে নিয়ে কোন অবস্থাতে এ সংগঠন চলতে পারে না। এই সমাজকে সুন্দর সাবলীল করতে হলে উভয়ের যৌথ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এই সমাজ সংশোধনের কাজ করবে আর নারীরা নারীদের সংশোধনের কাজ করবে। উভয়ের প্রচেষ্টাতে সমাজ বাগানে শান্তির ফুল ফুটবে, কল্যাণের ফল ধরবে। এই কাজে যারা বাধা সৃষ্টি করে তারা সমাজের শত্রু ও ইসলামের দুশমন। তারাও নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যে আছে। তাদের কথাও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, 'মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী

সকলে পরস্পর অনুরূপ ভাবাপন্ন। তারা অসৎ কাজের প্ররোচনা দেয়, সৎ কাজে বাধা দেয় এবং (আল্লাহর পথে ব্যয় করার ও কল্যাণজনক কাজে) তাদের হাত বন্ধ করে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে মহান আল্লাহও তাদের ভুলে গেছেন। নিশ্চয়ই মুনাফিকরাই ফাসিক। আল্লাহ ওয়াদা করেছেন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদের এবং কাফিরদের জন্য জাহান্নামের আগুনের। তাতে তারা চিরদিন থাকবে। তাই তাদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত, আর তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী আযাব।' (সূরা তওবা-৬৭,৬৮)

অতএব, যারা মহিলাদের দ্বীনী দায়িত্ব পালন করতে বাধা সৃষ্টি করে, কুরআনের আলোকে তারা কারা তা বোধ হয় আর আমাদের বলার প্রয়োজন নেই। মহান আল্লাহ নিজেই তাদের পরিচয় স্পষ্ট ভাষায় দিয়ে দিয়েছেন।

ইতিহাসের পাতায় মুসলিম নারী

এবার ইতিহাস থেকে দেখব নারীরা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন, দ্বীনের দায়িত্ব কিভাবে পালন করেছেন। রসূলের জামানায় নারীরা শুধু দ্বীনের দায়িত্ব নিজেরাই পালন করেননি, তাদের প্রভাবে, উৎসাহে, দাওয়াতে বহু নামী দামী পুরুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আজকের নারী সমাজ দাওয়াতী দ্বীনের দায়িত্ব পালনে পিছিয়ে পড়েছে, অথচ তখনকার দিনে নারীরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। আল কুরআনের প্রথম নির্দেশ, 'পড়, তোমার প্রভুর নামে...।' এই নির্দেশ অমান্য করার কারণে আমরা আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছি। তাই আসুন, কুরআন-হাদীস ও ইতিহাস থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি। আমাদের কর্মসূচী জেনে নেই। আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার আগে আল্লাহর নির্দেশগুলো সঠিকভাবে পালন করার চেষ্টা করি।

দাওয়াতে দ্বীনে ও দ্বীনের ওপর অটল হয়ে থাকার এ দায়িত্ব শুধু আজকের যুগের মহিলাদের জন্যই ফরজ নয়, বরং অতীতের মহিলারা এ দায়িত্ব পালন করেছেন আরও নিষ্ঠার সাথে, জীবন বাজি রেখে।

মুহাম্মাদ স.-এর পূর্বে

বিবি আসিয়া

বিবি আসিয়া ছিলেন খোদায়ী দাবীদার মহাপাপিষ্ঠ ফেরাউনের স্ত্রী। ফেরাউন আর বিবি আসিয়াকে জানে না এমন কেউ আমাদের মুসলিম সমাজে আছে বলে আমার জানা নেই। সেই ফেরাউনের সমাজে মহান আল্লাহ পাঠালেন মুসা আ.-কে। মুসা আ. সেই সমাজের সাধারণ জনগণ ও স্বয়ং ফেরাউনকে দাওয়াত দিলেন এক আল্লাহকে রব হিসাবে মেনে নেওয়ার জন্য। ফেরাউন বলল, 'আমিই রব। আমার ওপর আর কোনো রব আছে বলে আমার জানা নেই।' জনগণ দু'ভাগ হয়ে গেল। বৃহৎ সংখ্যক লোক ফেরাউনকে রব হিসাবে মেনে নিল। অল্প সংখ্যক সত্যসন্ধানী মানুষ ফেরাউনকে

অস্বীকার করল। আর তাদের ওপর নেমে এল সীমাহীন নির্যাতন। এই সত্যসন্ধানীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সম্রাজ্ঞী আসিয়া। তিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে বুঝেছিলেন ফেরাউনের মিথ্যা অলীক দাবীর অসারতা। মেনে নিয়েছিলেন মুসা আ.-কে মহান আল্লাহর প্রেরিত নবী হিসাবে। আত্মসমর্পণ করেছিলেন মুসা আ.-এর আনীত দ্বীনের ওপর। মুসা আ. তাঁর কাছেই লালিত-পালিত হয়েছেন। ছোট থেকেই তিনি দেখেছেন মুসা আ.-এর উন্নত নৈতিক চরিত্র, দেখেছেন সত্যবাদিতার মূর্ত প্রতীক হিসাবে। মহান এই ব্যক্তিত্বকে চিনতে তাঁর মোটেও সময় লাগেনি। তাঁর সামনে তখন দু'টি পথই খোলা ছিল। একদিকে মুসা আ.-এর দ্বীনকে অস্বীকার করে স্বামীর অনুগত স্ত্রী হিসাবে ফেরাউনের কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে ভোগ বিলাস আর সুখ-সুবিধায় জীবন অতিবাহিত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। তিনি বেছে নিলেন সত্য ও সুন্দরের পথ। তিনি সাহসী ও দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ বা রব নেই' যার ফলশ্রুতিতে তাঁর ওপর নেমে এল ভয়াবহ দুঃখ-যন্ত্রণা। কিন্তু তিনি বুঝে নিয়েছিলেন পরকালীন মুক্তি নিহিত আছে এরই মধ্যে। তাই তো শত অত্যাচারেও তাঁর ঈমানের মধ্যে এতটুকু শিথিলতা দেখা দিল না। আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জীবন বিসর্জন দিলেন। কন্যা মাশেতাও মায়ের পদাংক অনুসরণ করে পিতার হাতে নির্যাতিত ও নিহত হন। মিরাজের সময় রসূল স.-কে দেখানো হয় অপূর্ব সুন্দর এক বাড়ি! রসূল স. জিজ্ঞেস করলেন, 'এই বাড়িটি কার?' উত্তর এল, 'বাড়িটি ফেরাউন তনয়া মাশেতার।' বিবি আসিয়ার বাড়িটিও রসূল স.-কে দেখানো হয়।

মহিয়সী নারী হাজেরা

মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আ.। তাঁর উপযুক্ত জীবন সঙ্গিনী মহিয়সী বিবি হাজেরা। ইবরাহীম আ. মহান আল্লাহর নির্দেশে শিশু পুত্র ইসমাইল আ.-সহ রেখে আসলেন জনমানবহীন, বৃক্ষ লতাপাতা ও পানিশূন্য মরু প্রান্তরে। প্রথমে হাজেরা বুঝি পেরেশান হয়ে গেলেন! জিজ্ঞেস করলেন ইবরাহীম আ.-কে, 'আপনি কি আল্লাহর নির্দেশে আমাদের এখানে রেখে যাচ্ছেন?' ইবরাহীম আ. বললেন, 'হ্যাঁ।' মহিয়সী হাজেরা নিশ্চিত হলেন। প্রশান্তিতে ভরে গেল তাঁর হৃদয়। বললেন, 'তাহলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের ধ্বংস হতে দেবেন না।' কত বড় বিশ্বাস! এরপর কত কষ্টে আর যত্নে বড় করে তুললেন শিশু ইসমাইল আ.-কে। কারো প্রতি নেই কোনো অভিযোগ, নালিশ— এরপরই এল আর এক পরীক্ষা। কুরবানী করতে হবে কিশোর পুত্রটিকে। কী কঠিন পরীক্ষা! আনুগত্যের কী চমৎকার উদাহরণ! ইবরাহীম আ.-এর এই সব কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পেছনে বিবি হাজেরার ভূমিকা অপরিসীম।

রসূলে করীম স.-এর যুগে

মহানবী স.-এর সাহাবীদের মধ্যে যেমন পুরুষ ছিলেন তেমনি মহিলাও ছিলেন। ইসলামের জন্য পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা কোনো অংশে কম ছিল

না। রসূল স.-কে ভালবাসার ক্ষেত্রে, দাওয়াতী কাজকে বেগবান করার লক্ষ্যে, দাওয়াতী কাজে অত্যাচার-নির্যাতনে, জানমাল উৎসর্গ করার ক্ষেত্রে, মহান আল্লাহর বিধান মান্য করার ক্ষেত্রে, প্রত্যক্ষ জেহাদের মাঠে আহতদের সেবা করা, স্বামী, পুত্র, সংসার আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিসর্জন দিতে মহিলারা কোনো অংশে কম ছিলেন না, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়ে নারীদেরকেই ইসলামের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে।

খাদীজাতুল কুবরা রা.

ইসলামের প্রথম মুসলিম নারী খাদীজাতুল কুবরা রা.। তিনি উম্মুল মুমিনীন। মক্কা নগরীর সব চেয়ে ধনী মহিলা। যখন নবীজির ওপর প্রথম ওহী নাযিল হয় তিনি এক মুহূর্ত দেরী করেননি। সাথে সাথে তা সত্য বলে গ্রহণ করেন। নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের কাজে, রসূল স.-কে সহযোগিতা করেছেন তাঁর সমস্ত সত্তা দিয়ে। বিপদে, মুসিবতে, সংকটে, সংঘাতে, সংঘর্ষে, দুর্যোগে মহানবী স.-এর পাশে থেকে তাঁকে সাহস ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। নিজের বিপুল অর্থ-সম্পদ উজাড় করে দিয়েছেন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে। নিজের সকল প্রভাব-প্রতিপত্তি, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি দিয়ে ইসলামের খেদমত করেছেন। যখনই কোন অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি হতো, লোকেরা নবী স.-এর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করত এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করত, তখন নবীজি স. ভীষণভাবে মর্মাহত হতেন। খাদীজা রা.-এর কাছে গেলেই তাঁর মনের কষ্ট দূর হয়ে যেত। খাদীজা রা. তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন। তাঁর দাওয়াতকে সম্পূর্ণ সত্য বলে সাক্ষ্য দিতেন। প্রথম যেদিন ওহী নাযিল হয়, সেই আশ্চর্যজনক ঘটনা রসূল স.-এর ওপর সীমাহীন প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে এসে বললেন, 'আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও।' খাদীজা রা. তাঁকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন। তারপর বললেন; 'আপনি কোথায় ছিলেন? আমি তো চিন্তিত হয়ে কয়েক জনকে আপনার সন্ধানে পাঠিয়েছি।' রসূল স. তাঁর কাছে ওহী নাযিল হওয়ার সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন। সব শুনে খাদীজা রা. বললেন, 'আপনি সত্য কথা বলেন, গরীবদের সাহায্য করেন, অতিথিপরায়ণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, আমানতদার ও দুঃখী মানুষদের খোঁজ-খবর নেন। এ ঘটনাকে আপনি পরম শুভ লক্ষণ হিসাবে গ্রহণ করুন এবং অবিচল থাকুন। আল্লাহ আপনাকে কোনদিন কোনমতে অপদস্ত করতে পারেন না।' (বুখারী)

কত বিবেচিত সান্ত্বনা! কত বড় বিশ্বাস! নবুওয়াতের মহান দায়িত্বের শুভ উদ্বোধন হলো নবীজির স. প্রিয়তমা পত্নী জীবন সঙ্গিনীর অপূর্ব সাহস ও দীপ্ত কণ্ঠের সাক্ষ্য বাক্যের মাধ্যমে। খাদীজা রা.-এর পরেই পিতৃব্য পুত্র কিশোর আলী রা., তারপর নবীজির স.-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবু বকর রা. ইসলাম গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে নবী স. আল্লাহর আদেশ প্রাপ্ত হতে লাগলেন এবং আশেপাশে মক্কার চতুর্দিকে আল্লাহর বাণী প্রচার করতে লাগলেন। তৌহিদের দাওয়াত শুনে জাহিল আরবগণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

কিন্তু আস্তে আস্তে ইসলাম গ্রহণকারী লোকের সংখ্যাও বৃদ্ধি হতে লাগল। ইসলামের ব্যাপকতায় হযরত খাদীজা রা. খুবই আনন্দিত হতেন। অমুসলিম আত্মীয়-স্বজনের বিদ্রূপ-উপহাসকে উপেক্ষা করে নিজেকে রসূল স.-এর একনিষ্ঠ উম্মত হিসাবে প্রমাণ দিতে লাগলেন। তিনি তাঁর বিপুল ধন-সম্পদ সকল কিছু ইসলামের জন্য, এতীম বিধবাদের জন্য, নওমুসলিম ও অসহায় অভাবগ্রস্তদের সাহায্যার্থে ওয়াকফ করে দিলেন। সেই দুর্যোগপূর্ণ দিনে হযরত খাদীজাতুল কুবরা রা. শুধু রসূল স.-এর দুঃখের ভাগীদারই ছিলেন না. তিনি প্রতিটি বিপদে-আপদে তাঁকে সাহায্যের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন। প্রিয় নবীজি স. বলতেন, 'কাফিরদের কোন কথা বা আচরণ যখন আমার নিকট অসহনীয় মনে হতো তখন আমি তা খাদীজাকে বলতাম। সে আমাকে এমনভাবে সাহস যোগাত যে, আমার অন্তর শান্ত হয়ে যেত। আর এমন কোন দুঃখ ছিল না যা খাদীজার কথায় অবসান ও হালকা হতো না।' (বুখারী)

একবার জিবরীল আ. রসূল স.-এর কাছে তাশরিফ এনে বললেন, 'খাদীজা রা. আসছেন আপনার জন্য খাবার নিয়ে, আপনি তাঁকে আল্লাহর তরফ থেকে ও আমার তরফ থেকে সালাম পৌছে দেবেন।' নবুয়াত প্রাপ্তির সাত বছর পর যখন কাফির মুশরিকরা কোন অবস্থাতেই ইসলামের অগ্রগতি প্রতিহত করতে পারছিল না, দিনে দিনে সত্যপিয়াসী মানুষ ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল, অত্যাচার আর নির্যাতনেও কোন কাজ হচ্ছিল না, তখন কুরাইশ মুশরিকরা বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবকে শেষে আবু তালিবকে অবরোধ করে। এই বিপদের সময় খাদীজা রা. অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও পূর্ণ সাহসিকতার সাথে তিনটি বছর অবরুদ্ধ জীবন যাপন করতে বাধ্য হন। অর্ধাহার, অনাহার ও মানসিক কষ্টে খাদীজা রা.-এর শরীর ভেঙে পড়ে। নবুওয়তের দশম বছর অবরোধ শেষ হয়। এর অল্প কিছু দিন পরেই খাদীজা রা. ইন্তিকাল করেন। খাদীজার রা.-এর মৃত্যুতে রসূল স. শোকে মুষড়ে পড়েন। ইন্তিকালের পরও তাঁর প্রতি রসূল স.-এর গভীর ভালবাসা বিদ্যমান ছিল। এমন কোন দিন ছিল না যেদিন তিনি তাঁর প্রশংসা করতেন না। যখনই কোন বকরী-দুম্বা জবাই করতেন তখন খাদীজার বান্ধবীদের কাছে আগে গোশত পাঠাতেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজন এলে খুব আদর-যত্ন করতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. বলেন, একদিন রসূল স. যথারীতি খাদীজার রা. প্রশংসা করতে লাগলেন। আমার ঈর্ষা হলো। আমি বললাম, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি একজন বৃদ্ধা মহিলা ছিলেন। আল্লাহ কি তাঁর পরিবর্তে আপনাকে আরও উত্তম স্ত্রী দেননি?' একথা শুনে রসূল স.-এর চেহারা লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'খোদার কসম! খাদীজা থেকে ভাল স্ত্রী আমি পাইনি। যখন সবাই কাফির ছিল তখন সে ঈমান এনেছিল। সবাই যখন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তখন সে আমাকে সত্য হিসাবে মেনে নিয়েছিল। সে নিজের সকল ধন-সম্পদ ও সুখ-শান্তি আমার জন্য কোরবানী করে দিয়েছিল। যখন অন্যরা আমাকে বঞ্চিত করেছিল তখন আল্লাহ তাঁর গর্ভে আমার সন্তান দিয়েছিলেন।' প্রিয় নবীজি তাঁর জন্য সমস্ত জীবন শোক প্রকাশ করেছেন। তাঁর অতুল অবদান, অনাবিল খেদমত, অপূর্ব সেবা, অপরিশোধ্য ঋণের

কথা আল্লাহর নবী স. অসংখ্যবার ঘোষণা করেছেন। তিনি বলতেন, 'বনী ইসরাঈলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নারী মরিয়ম আর আমার উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নারী খাদীজা।' (বুখারী ও মুসলিম) এই শ্রেষ্ঠতম নারীর জীবনালেখ্য থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। তাঁকেই করতে হবে আমাদের জীবনের আদর্শ। তিনি যেমন করে জান-মাল উজাড় করে দিয়েছেন ইসলামের জন্য, জীবন সাথীকে দ্বীনের কাজে সহযোগিতা করেছেন নিজের সকল সত্তা দিয়ে, তেমনি আমরা যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করি তারা সবাই যেন তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করি। আমাদের জীবন ও মরণ হয় যেন শুধু ইসলামের জন্য, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আমরা যেন হতে পারি খাদীজাতুল কুবরা রা.-এর উত্তম উত্তরসুরি। আমীন, ছুম্মা আমীন!

হযরত সুমাইয়া রা.

প্রথম জীবনোৎসর্গকারিণী সাহাবী এই মহিয়সী নারী। রসূল স. যখন নবুয়ত পাননি, মানুষকে কালেমার দাওয়াত দেননি, তখন মক্কার কুরাইশরা তাঁকে আল আমিন, আস সাদিক কত নামেই না সাদর সম্ভাষণ করেছে! যখনই রসূল স. নবুওয়াত পেলেন, হকের দাওয়াত পেশ করতে লাগলেন, তখনই তারা নবীজির খুন পিপাসু হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, যারাই সত্য দ্বীনের প্রতি সাড়া দিতেন তাদের ওপর নেমে আসত জুলুম-নির্যাতন। তাতে পুরুষ বা মহিলার মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। সেই যুগে নবী স. বনু মাকযুমের মহল্লা দিয়ে একদিন অতিক্রম করছিলেন। এমন সময় দেখতে পেলেন কুরাইশ কাফেররা একজন বার্ধক্যপীড়িত মহিলাকে লোহার বর্ম পরিয়ে রোদে তপ্ত বালিতে শুইয়ে পাশে দাঁড়িয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে। মহিলাটিকে সম্বোধন করে বলছে, 'মুহাম্মাদের দ্বীন কবুল করার স্বাদ কি তা বুঝে নে।' নির্মম নির্যাতনের শিকার অসহায় এই বৃদ্ধা মহিলাকে দেখে নবীজির বুক ভেঙে গেল। তিনি অশ্রু সজল হয়ে বললেন, 'ধৈর্য ধর। তোমার ঠিকানা জান্নাত।' প্রচলিত বংশ মর্যাদার ধারণা অনুযায়ী এই মহিয়সী মহিলা কোন উচ্চ বংশের মহিলা ছিলেন না। তিনি ছিলেন আবু হোযায়ফা বিন মুগীরা মাখজুমীর ক্রীতদাসী। কিন্তু চিন্তা-চেতনা ও বিবেক-বুদ্ধির দিক দিয়ে তিনি ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ মহিলাদের মধ্যে সেরা। সুমাইয়াকে দিয়ে তখন মুসলমানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল সাতে। কোন বর্ণনায় পাওয়া যায়, সুমাইয়া মহিলাদের মধ্যে দ্বিতীয় মুসলমান। এই নতুন প্রচারিত দ্বীনের প্রতি ঈমান আনার পরিণাম তিনি জানতেন, কিন্তু কোনো ভয়-ভীতিই তাঁকে এ পথ থেকে টলাতে পারেনি। জাহান্নামের কীট আবু জেহেলের হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন এই জান্নাতী নারী। এই নির্যাতিত মহিয়সী জান্নাতী নারীর নাম হযরত সুমাইয়া বিনতে খারাত রা.। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আম্মারের মা এবং প্রথম পুরুষ শহীদ সাহাবী ইয়াসিরের স্ত্রী। তিনি জীবন দিয়ে আমাদের কাছে প্রমাণ পেশ করে গেছেন। আল্লাহর দ্বীনের ওপর অটল থেকে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার

জন্য জান ও মাল বড় তুচ্ছ জিনিস! আর তাই তো তিনি নিজ কানে দুনিয়া থেকেই শুনে গেছেন জান্নাতের সুসংবাদ। পেয়েছেন প্রথম শহীদ হওয়ার দুর্লভ মর্যাদা।

উম্মে আম্মারা রা.

ইসলামের জন্য, ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আত্মোৎসর্গকারী মহিলাদের মিছিল অনেক বড়। এই মিছিলের প্রথম কাতারের আর এক নারী ছিলেন বীরাঙ্গনা খাতুনে ওহুদ বা ওহুদ কন্যা উম্মে আম্মারা। প্রথম বায়আতে আকাবার পর উম্মে আম্মারা ইসলাম গ্রহণ করেন। নবুওয়াতের ১৩তম বছরে তিনি সেই ৭২ জনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। এটাকে বলে বড় আকাবার বায়াত। যাঁরা বড় আকাবাতে প্রিয় নবী স.-এর হাতে বায়আত করেছিলেন তাঁরা রসূল স. ইয়াসরিব আসলে তাঁকে জানমাল ও সন্তানসহ সমর্থন করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। হিজরতের তৃতীয় বছর ওহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

হযরত উম্মে আম্মারা এই যুদ্ধে অংশ নেন এবং এমন বীরত্ব, দৃঢ়তা ও অটলতা প্রদর্শন করেন যে, রসূল স. তাঁকে খাতুনে ওহুদ উপাধিতে ভূষিত করেন। যুদ্ধ শেষে উম্মে আম্মারার ক্ষত স্থান থেকে দরদর কারে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। হুজুর স. তাঁর ক্ষতস্থানে নিজে পট্টি বাঁধলেন এবং কয়েকজন বাহাদুর সাহাবীর নাম উচ্চারণ করে বললেন, 'আল্লাহর কসম! আজ উম্মে আম্মারা তাদের সবার চেয়ে বাহাদুরী প্রদর্শন করেছে।' উম্মে আম্মারা তখন বলেন, 'হে আল্লাহর রসূল, আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আমার জন্য দোয়া করুন যেন জান্নাতেও আপনার সাথে থাকার সৌভাগ্য হয়।'

নবীজি স. উম্মে আম্মারার জন্য দোয়া করলেন আল্লাহর দরবারে। উম্মে আম্মারা খুশীতে বলে উঠলেন, 'দুনিয়ার আর কোনো বিপদকেই আমি পরওয়া করি না।' যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে উম্মে আম্মারা অদূরে আহত সৈনিকদের সেবা-শুশ্রূষা করছিলেন, পানি পান করাচ্ছিলেন। কিন্তু যখন যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল কাফিররা ঝাঁপিয়ে পড়ল নবী করীম স.-এর ওপর চারদিক থেকে, তখন উম্মে আম্মারা পানির মশক ফেলে দিয়ে তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কাফেরদের ওপর। পরবর্তী সময় ওহুদের প্রসঙ্গ আসলেই নবী স. বলতেন, 'ওহুদের দিন ডানে বামে যেদিকেই নজর দিতাম শুধু উম্মে আম্মারাই লড়াই করছে দেখতাম।'

ওহুদের যুদ্ধে উম্মে আম্মারার দেহে ১২টি আঘাত লেগেছিল। রসূল স.-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর রা.-এর খেলাফত কালে হযরত খালিদ বিল ওয়ালিদ রা.-কে ভণ্ড নবী মুসায়লামা কাজ্জাবকে উৎখাত করার জন্য নিয়োগ করেন। উম্মে আম্মারাও এই বাহিনীতে যোগদান করেন। এই যুদ্ধে তিনি তরবারি ও বর্শার ১১টি আঘাত পান। একটি হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শুধু জান-মালই নয়, স্বামী-সন্তানও কুরবানী করেছেন তিনি ইসলামের জন্য। জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও তিনি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজ থেকে দূরে থাকেননি।

উম্মে সুলাইম রা.

বলিষ্ঠ ঈমানের অলংকারে সজ্জিতা সুদীপ্তা এক নারী উম্মে সুলাইম। নবুওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়েই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু জীবন সাথী মালিক বিন নজর কিছুতেই ইসলাম গ্রহণ করল না। মালিক বিন নজরের সাথে উম্মে সুলাইমের দাম্পত্য জীবন এত মধুর ছিল যা সেই জামানায় কিংবদন্তীর মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উম্মে সুলাইম জীবন সাথীকে জীবন দিয়েই ভালবাসতেন কিন্তু তাঁর ঈমান ছিল এত সুদৃঢ় যে, জীবন সাথীর প্রেম, দাম্পত্য জীবনের আকর্ষণ কিছুতেই তাঁকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। ইসলাম গ্রহণ করেই তিনি শিশু পুত্র আনাস রা.-কে ধীরে ধীরে ইসলামের পাক কালিমা শিক্ষা দিতে থাকেন। জীবন সাথী মালিক বিন নজর এতে ভীষণ রেগে যায়। চাপ দিয়ে ইসলাম থেকে সরানোর চেষ্টা করে। শেষে রাগ করে নিজেই সরে যায় উম্মে সুলাইমের জীবন থেকে। উম্মে সুলাইম জীবন সাথীকে খুবই ভালবাসতেন। কিন্তু ইসলামের চেয়ে বেশী নয়। তাই তিনি ধৈর্যের সাথে এই বিপদের মোকাবেলা করেন। পুত্র আনাস রা.-এর বয়স যখন দশ বছর তখন তিনি একদিন পুত্রের হাত ধরে রসূল স.-এর কাছে আসেন এবং পুত্রকে রসূল স.-এর খেদমতে পেশ করেন। এর কিছু দিন পরেই আবু তালহা তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। আবু তালহা তখনও ইসলাম কবুল করেননি। উম্মে সুলাইম শিরকের কারণে প্রথম স্বামীর প্রেমময় সম্পর্কের বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করেছেন। এখন তিনি অন্য একজন মুশরিককে কি করে বিয়ে করতে পারেন? তাই বিনয়ের সাথে তিনি এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করেন। কিছুদিন পরেই আবু তালহা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উম্মে সুলাইমকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। পুত্র আনাসের বয়স তখন ষোল বছর। উম্মে সুলাইম আবু তালহার ইসলাম গ্রহণে এত খুশী হয়েছিলেন যে, তিনি বলেন, 'আবু তালহার সাথে আমার বিয়ের মোহর হবে ইসলাম।' হযরত সাবিত রা. বলতেন, 'আমি কোনো মহিলার মোহর উম্মে সুলাইমের থেকে উত্তম ছিল বলে শুনিনি। আবু তালহা উম্মে সুলাইমের দাওয়াতেই ঈমান আনেন। যখন আবু তালহা উম্মে সুলাইমকে বিয়ের প্রস্তাব দেন তখন উম্মে সুলাইম আবেগঘন কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আমি তো মুহাম্মাদ স.-এর প্রতি ঈমান এনেছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রসূল। অবশ্য তোমাদের জন্য আফসোস যে, তোমরা পাথরের বা কাঠের মূর্তির পূজা করো, যা তোমাদের ভাল মন্দ কিছুই করতে পারে না।' এই কথাগুলো এমন হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে উচ্চারিত হয়, যাতে ইসলামের সত্যতা আবু তালহার কাছে প্রতিভাত হয় এবং কয়েকদিন চিন্তা করার পর তিনি মুসলমান হন। আবু তালহা ছিলেন খুবই মামুলী ধরনের লোক। উম্মে সুলাইমের দাওয়াতে, উম্মে সুলাইমের সংস্পর্শে তিনি হন হযরত আবু তালহা রা. আশারে মুবাশ্বারাদের একজন। অন্যান্য মুসলিম নারীদের মত উম্মে সুলাইমও পুরুষের পাশাপাশি অনেক যুদ্ধে অংশ নেন। মহান আল্লাহ তাঁর রসূল স. ও ইসলামের প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসাই ছিল তাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

নাম না-জানা এক বেদুঈন কন্যা

এবার নাম না-জানা এক সাহাবীর কথা বলি। তিনি তৎকালীন সম্ভ্রান্ত বংশের কেউ ছিলেন না। তিনি ছিলেন যাযাবর এক বেদুঈন কন্যা। ফেরি করে প্রসাধনী বিক্রি করতেন যার কারণে সম্ভ্রান্ত কুরাইশদের বাড়ির অভ্যন্তরেও তিনি যেতে পারতেন। তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রসাধনী ও সুগন্ধী বিক্রি করতেন, সেই সাথে মহিলাদের কাছে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ইসলামের দাওয়াত দিতেন। আর এভাবেই কুরাইশদের কঠিন প্রহরা ভেদ করে তাদের গৃহাভ্যন্তরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যায়। বেশ কিছু কুরাইশ মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর কিছু মহিলা পালিয়ে স্বামী, সন্তান, সংসার, নিরাপত্তা সব ত্যাগ করে মক্কা থেকে মদীনায় চলে যান। এ ঘটনায় কুরাইশরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। কিভাবে তাদের নারীদের কাছে এই দাওয়াত পৌঁছাল তার অনুসন্ধান করতে থাকে। কিছু দিনের মধ্যেই কুরাইশ সরদারদের কাছে বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়। একদিন কুরাইশদের পাষণ্ড নেতারা তাঁর সব পণ্যদ্রব্য ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দেয়। তাঁকে ভীষণভাবে মার-ধর করে, তারপর একটি উটের সাথে বেঁধে উটটিকে মরুভূমির দিকে তাড়িয়ে দেয়। উটটি মরুভূমির দিকে উর্ধশ্বাসে দৌড়াতে থাকে। তিনি বলেন, আমি জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম, তবু চিৎকার করে আল্লাহর সাহায্য চাচ্ছিলাম। মহান আল্লাহ আমাকে রহম করলেন। কিছু রহমদীল মানুষের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করলেন। মদীনাগামী একটি কাফেলা আমাকে বহনকারী উটটিকে ধরে ফেলে এবং আমাকে উদ্ধার করে ফাতেমা বিনতে খাত্তাবের হাতে সোপর্দ করেন।

ফাতিমা বিনতে খাত্তাব রা

ইতিহাসের পাতা খুললে দেখা যাবে, ইসলামের জন্য শত শত নারীর আত্মত্যাগে ভরপুর ইতিহাসের পাতা। যে সব সাহাবী ইসলামের জন্য আত্মত্যাগকারী মনীষী তাঁদের প্রায় সবার পেছনেই আছে কোনো না কোনো নারীর অবদান। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর রা. যাঁর ইসলাম গ্রহণের ফলে নির্যাতিত মুসলমানদের মাঝে যেন নব জীবনের সঞ্চার হয়, হতাশায় ভেংগে পড়ে কুরাইশদের অন্তর। এই ওমর রা.-এর ইসলাম গ্রহণ করার পেছনেও তো ছিল এক অকুতোভয় নারীর অবদান। তাঁর ছোট বোন ফাতিমা বিনতে খাত্তাব। ঘটনা আমরা সবাই জানি, হযরত হামজা রা. ইসলাম গ্রহণ করেছেন শুনে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ মহাভাবনায় পড়ে গেল। একটা আশু প্রতিকারের আশায় 'দারুন্নাদুয়ায়র' জরুরী সভায় ঘোষণা দেওয়া হলো, 'যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের স.-এর ছিন্ন মস্তক এনে দিতে পারবে তাকে একশ' উট ও চল্লিশ হাজার দেরহাম পুরস্কার দেওয়া হবে।' এ ঘোষণার পর উগ্র মূর্তিতে ওমর খোলা তরবারি হাতে ছুটে চলেন রসূল স.-কে হত্যা করতে। পথে দেখা হয় নাঈম ইবনে আব্দুল্লাহর সাথে। তাঁর কাছে জানতে পারলেন তাঁর বোন ফাতিমা ও তাঁর স্বামী সাঈদ ইসলাম গ্রহণ করেছে। ওমরের মাথায় যেন খুন চড়ে গেল! তিনি বোন ও ভগ্নীপতিকেই আগে

শায়েস্তা করতে চাইলেন। বোনের ঘরের কাছে আসতেই শুনতে পেলেন কুরআন পড়ার আওয়াজ। দরজায় করাঘাত করতেই ফাতিমা দরজা খুলে দিলেন। ওমর ফাতিমা আর সাঈদকে মারতে মারতে বলতে লাগলেন, 'তোমরা কি পড়ছিলে আমাকে দেখাও।' একখণ্ড কাগজে সূরা ত্বহার কয়েকটি আয়াত লেখা ছিল, ফাতিমা আর সাঈদ তাই পড়ছিলেন। ফাতেমার মনে সন্দেহ হলো ওমর কাগজ খণ্ড ছিড়ে ফেলতে পারেন। তাই তিনি কিছুতেই কুরআনের সেই অংশ ওমরের হাতে দিতে রাজী হলেন না। এক পর্যায়ে রক্তাক্ত ফাতিমা দৃপ্ত ও অগ্নিঝরা কণ্ঠে বললেন, 'ভাই, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, এক আল্লাহকে রব মেনেছি- এই আমাদের অপরাধ! তুমি কি করে পাথরের মূর্তিকে পূজা কর, যে ভাল-মন্দ কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না? এতে তোমার কোন অপরাধ হয় না? আমাদের মেরে ফেললেও আমাদের বিশ্বাস থেকে একটুও সরব না।' বোনের যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে ওমর একটু শান্ত স্বরে বলল, 'তোমরা কি পড়ছিলে আমাকে দেখাও।' বোন ফাতিমা তাঁকে গোসল করে আসতে বাধ্য করলেন। তারপর কুরআনের সেই লিখিত অংশটুকু ওমরের হাতে তুলে দিলেন। মুহূর্তে বদলে গেলেন ওমর। থরথর করে কেঁপে উঠল তাঁর দেহ মন। ওমর মুসলমান হলেন। হয়ে গেলেন হযরত ওমর ফারুক রা.।

উম্মে হাকাম রা.

আর এক মহিয়সী নারীর কথা না বললেই নয়। তিনি এক কাফের ইকরামার স্ত্রী। ইকরামা বাপের মতই জঘন্য কাফের ছিল। মক্কা বিজয়ের পর সবাইকে ক্ষমা করে দিলেও রসূল স. দশ জনকে ক্ষমা করেননি। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল, কাবা ঘরের গেলাবের নিচে লুকালেও এদের হত্যা করা হবে। এদের মধ্যে একজন আবু জেহেলের পুত্র ইকরামা। উম্মে হাকাম পূর্ব থেকেই মনে মনে ইসলামের প্রতি দুর্বল ছিলেন, কিন্তু কাফের স্বামীর ভয়ে চুপ করে ছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ দিকে মুসলমানদের মক্কা বিজয়ের পর ইকরামার পলায়ন করা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। উম্মে হাকাম জীবন সাথীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি রসূলাল্লাহ স.-এর কাছে যেয়ে ইকরামার জীবনের নিরাপত্তার আবেদন জানান। নবীজি তা মনজুর করেন। উম্মে হাকাম আবার বলেন, 'আমাকে একটি লিখিত নিরাপত্তা লিপি দিন।' রসূল স. তাঁকে তাই দেন। সেই লিখিত নিরাপত্তা-নামা হাতে নিয়ে উম্মে হাকাম ইয়েমেনের পথে যাত্রা করেন। তখন ঘোড়া ছাড়া দ্রুত যাতায়াতের আর কোন মাধ্যম ছিল না। উম্মে হাকাম আগেই জানতেন ইকরামা ইয়ামেন যাবে। সেখান থেকে আরব সাগর পার হয়ে চলে যাবে দূর বিদেশে। মুসলমানদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। উম্মে হাকাম বুঝেছিলেন আরব সাগর পার হয়ে চলে গেলে জীবন সাথী ইকরামা হারিয়ে যাবে তাঁর জীবন থেকে। দুনিয়ায় ও আখেরাতেও। তাই ইকরামাকে ফিরিয়ে আনার জন্য জীবনটাই বাজি ধরলেন উম্মে হাকাম। ঘোড়া নিয়ে ছুটে চললেন। পাঁচ দিনের রাস্তা দু'দিনে অতিক্রম করলেন। ঘোড়াকে রাস্তায় এক

ফোঁটা বিশ্রাম দেননি। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ইয়েমেন পৌঁছেই ঘোড়াটি মারা যায়। কিন্তু হায়! যে আত্মীয় বাড়িতে ইকরামার আসার কথা ছিল সেখানে যেয়ে শুনলেন ইকরামা এসেছিল। রাতটা এখানে পার করেই প্রত্যূষে সে চলে গেছে সাগরের দিকে। উম্মে হাকাম আর কাল বিলম্ব না করে ছুটে চললেন সাগর পানে। তার একটাই ভয়, সাগর পার হয়ে গেলে আর পাওয়া যাবে না ইকরামাকে। ইকরামা ততক্ষণে পৌঁছে গেছে সাগর পাড়ে। নৌকাও পেয়ে গেছে। ইকরামা বলল, 'মাঝি, নৌকা ছাড়।' কিন্তু মাঝি বলল, 'আপনি এত অস্থির হচ্ছেন কেন? আর দু'একজন যাত্রী আসুক।' 'না মাঝি, তুমি বুঝতে পারছ না, মুসলমানেরা মক্কা দখল করে নিয়েছে। আমরা চরমভাবে পরাজিত হয়েছি। কাবা'র সব দেবদেবীর মূর্তি ভেঙে চুরমার করে ফেলা হয়েছে। আমি সারা জীবন এদের বিরোধিতা করেছি। আমাকে ধরতে পারলে আমার আর উপায় নেই।' মাঝি মুসলমান, মৃদু হেসে বললেন, 'আপনি আল্লাহর রসূলের ভয়ে আল্লাহর জমীন ছেড়ে কোথায় যাবেন?'

চমকে উঠল ইকরামা, 'তুমি মুসলমান?'

'হ্যাঁ, তাতে কি? মুসলমান কারো ক্ষতি করে না।'

তারপর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে মাঝি আবার বললেন, 'এখনই নৌকা ছাড়ব। ঐ তো মনে হচ্ছে আর একজন যাত্রী আসছে।'

ইকরামা এবার ব্যকুল হয়ে উঠল, 'তুমি তাড়াতাড়ি নৌকা ছাড় মাঝি, এ লোক নিশ্চয়ই আমাকে ধরার জন্য আসছে। আমি তোমাকে তিন গুণ ভাড়া দিয়ে দেব।' মাঝি বললেন, 'থামুন। মনে তো হচ্ছে অশ্বারোহী একজন নারী। আপনি তো বীর পুরুষ! হাতে তরবারিও আছে। একজন নারীকে এত ভয় পাওয়ার কি আছে?' ততক্ষণে অশ্বারোহিণী আরো কাছে চলে এসেছে। ইকরামা চিনতে পারল উম্মে হাকামকে। উম্মে হাকাম কাছে এসে রসূল স.-এর লিখিত নিরাপত্তানামা দেখিয়ে বলল, 'চল, মক্কায় ফিরে চল।' ইকরামা তার পরও একটু ইতস্তত করছে দেখে মাঝি বললেন, 'আল্লাহর রসূল স. যাকে নিরাপত্তা দেন তার তো কোন ভয় থাকতে পারে না বন্ধু। তুমি ফিরে যাও তোমার দেশে। তোমার কোন ভয় নেই।' উম্মে হাকাম, ইকরামা এবার ফিরে এল ধীর গতিতে। প্রথমে ইয়েমেনে সেই আত্মীয়ের বাড়ি। রাতে থাকার সময় এক ঘরে থাকতে অস্বীকার করলেন উম্মে হাকাম। ইকরামা কারণ জানতে চাইলে দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমি মুসলমান আর তুমি এখনও মুশরেক। তোমার সাথে আমার বিবাহ বন্ধন আছে কিনা আমি জানি না। রসূল স.-এর অনুমতি ছাড়া তোমার সাথে আমি একত্রে বসবাস করতে পারব না।'

অবাক হলেও ইকরামা চুপ করে থাকল এই সিদ্ধান্তে। পরদিন তাঁরা পৌঁছলেন রসূল স.-এর দরবারে। ইকরামা তওবা করে মুসলমান হলেন। পেছনের সকল পাপ থেকে পরিশুদ্ধ হলেন। হয়ে গেলেন হযরত ইকরামা রা.। এ সময় উম্মে হাকাম জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের বিবাহ সম্পর্ক কি ঠিক আছে?' রসূল স. বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক আছে।' অত্যন্ত স্পষ্টভাষী ও সৎ সাহসের অধিকারিণী ছিলেন এই নারী।

প্রাণপ্রিয় জীবন সাথীকে ফিরিয়ে আনার জন্য জীবনের মায়া পরিত্যাগ করে ছুটে গিয়েছেন দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, অথচ ইসলামী শরিয়তে অনুমোদন আছে কিনা সেই ভয়ে তিনি তাঁর সাথে একান্তে বসবাসে রাজী হননি। যে ইকরামা ছিল ইসলামের জঘন্য শত্রু, এই নারীর প্রভাবে সেই ইকরামা ইসলামের জন্যই প্রাণ দিলেন। শহীদ হলেন।

সাফনাহ বিন্‌তে হাতিম তাঈ

সাফনাহ আদী ইবনে হাতিম তাঈ ইসলাম গ্রহণ করেন তার ছোট বোন সাফনাহ বিন্‌তে হাতিম তাঈ-এর দাওয়াত, উৎসাহ ও প্রেরণায়। হাতিম তাঈ-এর নাম শোনেনি এমন লোক আছে বলে আমার মনে হয় না। হাতিম তাঈকে নিয়ে অনেক কিংবদন্তী ও অনেক রূপকথা তৈরি হয়েছে। কিন্তু হাতিম তাঈ কোনো রূপকথার নায়ক ছিলেন না। আরবের প্রসিদ্ধ দাতা হাতিম তাঈ ইয়ামেনের তাঈ গোত্রের সর্দার ছিলেন। তিনি নিজের গোত্রসহ খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। প্রিয়নবী স.-এর নবুয়ত প্রাপ্তির কিছু দিন পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তার কন্যা হযরত সাফনাহ রা. বাপের মতোই নির্ভীক ও দানশীলা মহিলা ছিলেন। ইয়েমেনের লোকেরা দীর্ঘদিন থেকে মুসলমানদের সাথে শত্রুতা করে আসছিল। নবম হিজরতে রসূল স. হযরত আলী রা.-এর নেতৃত্বে একটি ছোট বাহিনী বনু তাঈতে প্রেরণ করেন। এই বাহিনীর আক্রমণের কথা শুনে তাঈ গোত্রের তৎকালীন সর্দার আদী ইবনে হাতিম পরিবার-পরিজন নিয়ে সিরিয়ায় চলে যান এবং জোশিয়াহ নামক পল্লীতে বসবাস শুরু করেন। আদী ইবনে হাতিম যাওয়ার সময় তাড়াহুড়া করাতে ছোট বোনকে সাথে নিতে পারেননি। বোন সাফনাহ মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে মদীনায় আসেন। সাফনাহ ছিলেন অত্যন্ত সৎ সাহসের অধিকারিণী ও বুদ্ধিমতী। তিনি মোটেও ভীত হলেন না, কান্নাকাটি করলেন না। রসূল স. যখন বন্দীদের দেখতে আসলেন তখন সাফনাহ এগিয়ে গিয়ে আদবের সাথে বললেন, হে কুরাইশ সর্দার! আমি বন্ধু-বান্ধবহীন ও সহায়হীন। আমার ওপর রহম করুন। পিতার স্নেহের ছায়া আমার ওপর থেকে উঠে গেছে। আমি আমার পিতার বড় আদরের দুলালী ছিলাম। আমাকে ফেলে আমার ভাই পালিয়ে গেছে। আমার পিতা বনু তাঈ-এর সর্দার ছিলেন। তিনি ক্ষুধার্তদের আহার করাতেন, এতীমদের অভিভাবকত্ব নিতেন, অভাবগ্রস্তদের অভাব দূর করতেন, মজলুমদের সাহায্য করতেন, জুলুমের মূল উৎপাটন করতেন। কোনো ভিক্ষুককে খালি হাতে যেতে দিতেন না। আমি সেই হাতিম তাঈ-এর কন্যা। আমি কোনোদিন কোনো মানুষের কাছে অনুগ্রহ চাইনি। আপনি ভাল মনে করলে আমাকে আজাদ করে দিতে পারেন। আমাকে যিনি মুক্ত করাবেন তিনি নেই। এজন্য আপনি নিজেই আমার ওপর রহম করুন। আল্লাহ আপনার ওপর ইহসান করবেন। রসূল স. সাফনাহর কথা মনোযোগ সহকারে শুনে বললেন, 'হে নারী! তোমার পিতার যে গুণাবলী

তুমি বর্ণনা করেছ তাতো মুসলমানের গুণাবলী। যদি তোমার পিতা জীবিত থাকতেন তাহলে আমরা তার সাথে ভালো আচরণ করতাম।'
এরপর তিনি সাহাবাদের নির্দেশ দিলেন, 'এই মহিলাকে আজাদ করে দাও। সে একজন সম্ভ্রান্ত ও উত্তম চরিত্রের পিতার সন্তান। কোন সম্ভ্রান্ত মানুষ অপমানিত হলে, কোন বিত্তবান ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হলে তার প্রতি ইহসান করো।'
সাহাবায়ে কেরাম রা. তৎক্ষণাৎ সাফনাহকে বন্ধনমুক্ত করে দিলেন। কিন্তু তিনি একই স্থানে দাঁড়িয়ে রইলেন। রসূল স. বললেন, 'আরো কিছু বলবে?
সাফনাহ আবেগের সাথে আরজ করলেন, 'হে দয়ালু ব্যক্তি, আমি যে পিতার কন্যা তিনি কওমকে মুসিবতে রেখে নিজে সুখের নিদ্রা যাওয়া মোটেও পছন্দ করতেন না। আমি তার মেয়ে হয়ে কি করে কওমকে ফেলে যেতে পারি? আপনি আমার ওপর দয়া করেছেন, আমার কওমের ওপরও দয়া করুন। আল্লাহ আপনাকে পুরস্কৃত করবেন।'
রসূল স. সাফনাহর কথা শুনে খুব প্রভাবিত হলেন এবং তাঈ গোত্রের সকল কয়েদীকে মুক্ত করে দিলেন। সাফনাহ জানতেন তার ভাই জোশিয়ায় আছে। ভাই আদী ইবনে হাতিম তাড়াহুড়ার মধ্যে বোনকে ফেলে এসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু এরপর অত্যন্ত মনোকষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করছিলেন। বোন মুসলমানদের হাতে বন্দী— এ কথা ভাবতেই হতাশায় বুক ভেঙে যাচ্ছিল। আদীর ভাই বোনের সাক্ষাত কিভাবে হলো তা আদীর ভাষাতে এরূপ, 'জোশিয়ায় একদিন আমাদের গৃহের সামনে একটি উট এসে থামল। হাওদার ওপর একজন নেকাব আবৃতা মহিলা বসে ছিলেন। আমার সন্দেহ হলো আমার বোন মনে হয়। কিন্তু তা কি করে হবে? তাকে তো মুসলমানেরা গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। সে এ রকম জাঁকজমকের সাথে কি করে আসতে পারে? ঠিক সেই সময় হাওদার পর্দা উঠল। সংগে সংগে আমার কানে এল, 'হে জালিম, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, তোমার ওপর থুতু নিক্ষেপ করি। নিজের পরিবার-পরিজন নিয়ে এসেছ আর পিতার মেয়েকে শত্রুর হাতে ছেড়ে এসেছ। তাঈ বংশের কলংক তুমি!'
সহোদরার কথা শুনে আমি খুবই লজ্জিত হলাম। নিজের ভুল স্বীকার কররাম, ক্ষমা চাইলাম। বোনকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ আরাম-বিশ্রামের পর আমি সাফনাহকে বললাম, 'বোন, তুমি তো খুব হুশিয়ার আর বুদ্ধিমতী। তুমি সেই কুরাইশের সাথে মোলাকাত করেছ। তুমি আমাকে সিদ্ধান্ত দাও কি করব।'
বোনটি জবাব দিল, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুমি তাঁর সাথে সাক্ষাত কর। যদি তিনি নবী হন তাহলে তাঁর সংগে সাক্ষাতের জন্য অগ্রগামী হওয়া মর্যাদা ও সৌভাগ্যের ব্যাপার। আর যদি বাদশাহ হন তাহলেও ইয়ামানের কেউ কিছু করতে পারবে না এবং আগুয়ান হয়ে সাক্ষাত করাতে তোমার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারে।'
সাফনাহর পরামর্শ অনুযায়ী আদী ইবনে হাতেম তাঈ মদীনায় পৌছে রসূল স.-এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। সাফনাহ তো আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কেমন সৌভাগ্যবতী, বুদ্ধিমতী, প্রত্যুৎপন্নমতি মহিলা যাঁর উসিলায় গোটা তাঈ গোত্র ও আদী ইবনে হাতিমের মত বিচক্ষণ ব্যক্তি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় পেলেন!

উম্মে দারদা রা.

ইতিহাসের গ্রন্থগুলো খুললে দেখা যাবে, শত সহস্র নারীর আত্মত্যাগে ভরপুর ইতিহাসের পাতা। তাদের জীবনের উদ্দেশ্যই ছিল ইকামতে দ্বীনের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। দুনিয়ার কষ্ট, দুঃখ, বিপদ, মুসিবত, নির্যাতন, নিপীড়ন, আর্থিক দৈন্য— এগুলো তাদের মোটেও বিচলিত করত না। আবু দারদা রা. যখন ঘরবাড়ি, বাগানসহ দ্বীনের জন্য রসূল স.-এর কাছে সঁপে দিয়ে এসে বললেন, 'উম্মে দারদা ঘর থেকে বের হয়ে এস। এই ঘরবাড়ি ও বাগান আমি আল্লাহর ওয়াস্তে দান করে দিয়েছি।' উম্মে দারদা বলতে পারতেন, 'এ কী সর্বনাশ তুমি করেছ! আমরা বাড়িঘর ছেড়ে কোথায় যাব?' কিন্তু না, তিনি খুশী মনে ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন আর বললেন, 'আবু দারদা, তুমি উত্তম সওদা করেছ।' আর এজন্যই তো মহান আল্লাহ বলেছেন, 'মুমীন নারী ও মুমীন পুরুষ পরস্পর বন্ধু ও সহযোগী।'

পরবর্তী জামানার নারী

আল্লাহর পথে দ্বীনের তরে প্রাণ উৎসর্গকারিণী মহিমান্বিতা নারীদের মিছিল অনেক বড়। সে মিছিলে শুধু রসূল স.-এর যুগের নারীরাই শামিল ছিলেন না, শামিল হয়েছেন পরবর্তী জামানারও অসংখ্য মহিমান্বিতা নারী। ইতিহাসের পাতায় যত বীর মুজাহিদ, মুজাদ্দিদ, পীর-মাশায়েখের কথা পাওয়া যায়, তাঁদের প্রায় সবার পেছনেই প্রেরণাদায়িনী, উৎসাহদায়িনীর কাজ করেছেন মাতা, ভগ্নী, জায়া হিসাবে কোন মহিয়সী নারী। বড় পীর হযরত আব্দুল কাদীর জিলানী র.-এর কথা আমরা সবাই জানি। তাঁকে জ্ঞানে-গুণে, এলেমে-আমলে মহিমান্বিত করে গড়ে তোলার পেছনে আছে এককভাবে তাঁর মায়ের অবদান।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া, যাঁর নাম ছিল আহমদ তাকিউদ্দিন। পিতার নাম আবদুল হালীম ইবনে আব্দুস সালাম। তাঁর পরদাদীর নাম ছিল তাইমিয়া। তিনি অত্যন্ত যোগ্য ও পরহেজগার মহিলা ছিলেন। তিনি ওয়াজ করতেন। নারী পুরুষ বহু মানুষের তিনি শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া নিজের নাম, বাবার নাম, দাদার নাম বাদ দিয়ে এই বুজুর্গ মহিলার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে ইবনে তাইমিয়া নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইবনে তাইমিয়া মানে তাইমিয়ার সন্তান।

জয়নাব আল গাজালী

বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মহিলা দায়ী জয়নব আল গাজালী। মিশরের ইসলামী আন্দোলনের নেত্রী। তার লেখা 'কারাগারে রাত দিন' বইটি পড়লে ইসলামী আন্দোলনের জন্য তার ত্যাগ ও তিতিক্ষার কথা জানা যাবে। অতীব আফসোস, আমাদের মুসলিম সমাজের মুসলিম নামধারী নারী-পুরুষ এ সব ইতিহাস জানেই না। তা না হলে তারা কিভাবে প্রশ্ন করে, রসূলের স্ত্রী-কন্যারা কি দাওয়াতী দ্বীনের কাজ করেছেন?

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.

তাঁর প্রথম স্ত্রী খাদিজাতুল কুবরা রা. তো দ্বীনের কাজেই মাল ও জান বিলিয়ে দিয়েছিলেন আর হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. ছিলেন এমন ব্যক্তিত্ব যাঁর ব্যক্তিগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অভিমত লক্ষ্য করুন :

মাশরুক বলেন, 'যাঁর হাতে আমার জীবন নিহিত তাঁর শপথ—আমি বড় বড় সাহাবীকে আয়েশা রা-এর কাছে ফারায়েজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে দেখেছি।' (তাবাকাতে ইবনে সায়াত)

ইমাম যুহরী বলেন, 'সকল পুরুষ ও নারীর এলেম একত্র করা হলে হযরত আয়েশা রা.-এর এলেম হবে তাঁদের সবার চেয়ে বেশী।' (তিরমিযি)।

হযরত আবু মুসা আশয়ারী বলেন, 'সাহাবী হিসাবে আমাদের সামনে এমন কোনো কঠিন বিষয় উপস্থিত হয়নি যা হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করে তাঁর কাছে জানতে পারিনি।' (আল এস্তিয়াব)

ওরওয়া ইবনে যুবায়ের বলেন, 'ফিকহ্, তিব ও কবিতা সম্পর্কে হযরত আয়েশার চেয়ে বেশী জ্ঞানী কাউকে আমি দেখতে পাইনি।' (মুসতাদরাকে হাকেম)

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফের পুত্র আবু সালমা বলেন, 'হযরত আয়েশার চেয়ে সুন্নাতে নববীর বড় আলেম, দ্বীনের সূক্ষ্ম তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ, কালামে মজীদের আয়াতের শানে নুযুল ও ফারায়েয সম্পর্কে বেশী জ্ঞানের অধিকারী আর কাউকে দেখিনি।' (আল এস্তিয়াব)

'আতা' ইবনে আবু রোবাহ বলেন, 'আয়েশা রা. ছিলেন সবচেয়ে বড় ফকীহ্, সবচেয়ে উত্তম মানুষ এবং লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সুস্থ মতের অধিকারিণী।'

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা.-এর জীবন ইতিহাস এত বিস্তৃত যে, স্বল্প কথায় তাঁর কৃতিত্বের কথা, জ্ঞান ও গুণের কথা আলোচনা করা অসম্ভব।

পরকালে জবাবদিহি করতে হবে সবাইকে

মহান আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে আমাদের সবাইকে। সবচেয়ে বড় কথা হলো একজন পুরুষকে যেমন তার সার্বিক কর্মকাণ্ডের জন্য রাব্বুল আলামীনের দরবারে জবাবদিহি করতে হবে, তেমনি একজন নারীকেও তার সার্বিক কর্মকাণ্ডের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এ ব্যাপারে কেউ কাউকে সাহায্য করবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'পুরুষ যা অর্জন করেছে সে তাই পাবে। আর নারী যা অর্জন করেছে সেও তাই পাবে।' (সূরা নিসা-৩২)

পিতা কিংবা স্বামী যত বড় দ্বীনদারই হোন না কেন, তাতে তার কিছু আসে যায় না যদি সে নিজে ভাল কাজ না করে। নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও লুত আ.-এর স্ত্রী রেহাই পায়নি। 'তার স্ত্রী ছাড়া তাকে ও তার আহলকে আমি নাজাত দিলাম।' (সূরা আরাফ ৮৩) আমার হিসাব আমাকেই দিতে হবে। আমাকেই সেই মহান আদালতে জবাবদিহি করতে হবে। আমার মাতা-পিতা, স্বামী-সন্তানের কাছ থেকে নেওয়া হবে না।

আল্লাহপাকের স্পষ্ট ঘোষণা, 'একজনের বোঝা অন্যজন বহন করবে না।' (সূরা বনি ইসরাইল-১৫) আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের মহিলারা স্বভাবতই ধর্মপ্রাণা। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিতা মহিলারা বহুলাংশে ইসলামের ব্যাপারে অজ্ঞ এবং ইসলামবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়। ইসলামবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় নারী ইসলামের প্রাথমিক যুগেও ছিল। যেমন রসূলের চলার পথে কাঁটা ছিটানো বৃদ্ধা। উম্মে জামিল, হিন্দা। তবে এরা ছিল সংখ্যায় কম। আল্লাহর জন্য, আল্লাহর রসূলের জন্য, ইসলামের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারিণী নারীর সংখ্যাই ছিল বেশী। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে নারীরাই যেন ইসলামের বিরোধিতা বেশী করছে! মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়ে, মুসলিম নাম ধারণ করে ইসলামের বিরোধিতায় তারা অমুসলিমদেরও হার মানায়। সবচেয়ে বড় কথা, সে যুগের বিরোধীরা সব কাফের ছিল, অমুসলিম ছিল। ইসলামের গণ্ডির মধ্যে একবার প্রবেশ করলে সে ইসলামের জন্য জীবন দিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র পিছপা হতো না। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এখনকার বিরোধীরা সবাই মুসলিম নামে পরিচিত, তবে ইসলামবিদ্বেষী। এই শিক্ষিতা মহিলাদের ইসলামবিদ্বেষী হবার কারণ অনেক।

ইসলামবিদ্বেষী হবার প্রধান কারণসমূহ

১. আধুনিক সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা। ২. ইসলামের সঠিক চর্চার অভাব। ৩. দাওয়াতী কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া। ৪. পুরুষদের অনৈসলামী কর্মকাণ্ড। ৫. সর্বোপরি ইসলামী সমাজ তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম না থাকা।

১. আধুনিক সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামকে জানার কোন ব্যবস্থা নেই, বরং ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার হাজারো পথ খোলা আছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে ইসলাম শিক্ষা নামে একখানা বই আছে ঠিকই কিন্তু কখনই অন্যান্য বিষয়ের মত গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো হয় না। কারণ যারা ভাল ছাত্র-ছাত্রী তারা বৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেয়, আর বৃত্তি পরীক্ষায় তো ইসলাম শিক্ষা থাকে না। এর পর কলেজ-ভার্সিটিতে তো ধর্মীয় শিক্ষা একেবারেই নেই। তাইতো দেখা যায়, মুসলমানের ছেলে-মেয়ে এম.এ. পাশ করার পরও কুরআন পড়তে জানে না। অনেকে তো হাদীস আর কুরআনের মধ্যে পার্থক্যই বোঝে না। যাবতীয় কুসংস্কারকে মনে করে ধর্ম। ইসলামকে মনে করে পশ্চাৎমুখিতা।

২. ইসলামের সঠিক চর্চার অভাব

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ইসলামের সঠিক চর্চার অভাব। আমাদের বর্তমান প্রজন্মের দুর্ভাগ্য যে, গৃহাঙ্গনে কুরআনের ধ্বনি তাদের কানে কোনদিন পৌছে না। কোনদিন তারা নিজের ঘরের লোককে নামায আদায় করতে দেখে না। আমরা এদিক দিয়ে ভাগ্যবান ছিলাম। আমাদের বাবা-মা, দাদা-দাদীকে নামায পড়তে ও কুরআন পড়তে দেখেছি। মায়ের হাতেই আমাদের কুরআন ও নামাযের হাতেখড়ি। দাদীর কাছে ইসলামের

গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী শুনেছি। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা তাই আমাদের মুরতাদের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেনি। আমাদের বর্তমান প্রজন্ম এদিক দিয়ে দুর্ভাগ্যের চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। ছেলেরা তবু জুম্মার নামাযে যায়, ঈদের সমাবেশে যায়, কিছু কথা তারা শোনে, কিন্তু মেয়েরা শুক্রবার দিন টিভিতে সিনেমা দেখা কিংবা পার্কে হাওয়া খেতে যাওয়া আর ঈদের দিনে সাজসজ্জা করে বেড়াতে যাওয়া ছাড়া এই দু'টি দিনের আর কোন গুরুত্বই বোঝে না।

৩. দাওয়াতী কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া

আমাদের সমাজ যে একেবারে বে-দ্বীন হয়ে গেছে তা নয়। এখনও অনেক দ্বীনদার কুরআন-হাদীস জানা আল্লাহওয়ালা লোক আছেন। কিন্তু তারাও তাদের প্রধান দায়িত্ব থেকে গাফিল হয়ে গেছেন। তাদের প্রধান দায়িত্বই ছিল এ দাওয়াত তাদের কাছে পৌঁছানো যারা দাওয়াত পায়নি। ইসলামের প্রধান শক্তিই হলো দাওয়াতী কাজ। এই দাওয়াত দানকারীদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন, 'তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে লোকদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেক আমল করে আর বলে, আমি একজন মুসলিম।' (হামিম আস-সিজদা-৩৩)

আমাদের সমাজ থেকে নামায-রোজা, হজ্জ্ব-যাকাত উঠে গেছে কি? না, তাও যায়নি। একটা নির্দিষ্ট বয়স পার করে দিয়ে প্রায় প্রত্যেকেই নামায-রোজার পাবন্দ হয়। হজ্জ্বও করে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামকে মানে না, অথচ মহান আল্লাহ্ বলেন, 'তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের একাংশের ওপর ঈমান এনেছ এবং অপরাংশ অস্বীকার করছ?' (বাকারা-৮৫) জীবনের প্রতিটি দিকে ইসলামকে মানতে হবে এবং দাওয়াত দিতে হবে সবাইকে মানার জন্য।

৪. পুরুষদের অনৈসলামী কর্মকাণ্ড

এর চতুর্থ কারণ হচ্ছে পুরুষদের অনৈসলামী কর্মকাণ্ড। পুরুষদেরকে মহান আল্লাহ দায়িত্ব দিয়েছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন। আমাদের সমাজের প্রত্যেকটি নারী ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, পুরুষদের কর্তৃত্ব মেনে চলে। সে বিষয়টি আমাদের ইসলাম থেকে লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে নিয়ে গেছে। আমাদের মধ্যবিত্ত নারী সমাজ স্বভাবতই আল্লাহভীরু। শিক্ষার অভাবে তারা ইসলাম থেকে দূরে থাকলেও দাওয়াত পাওয়ার সাথে সাথেই নিজেদের ভুল বুঝতে পারে। অনুতপ্ত হয়ে ইসলামকে মানতে চায় পরিপূর্ণভাবে। কিন্তু তখন তাদের সামনে প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তাদের কর্তা পুরুষটি। একটি ঘটনা এখানে না বললেই নয়। এক কলেজের প্রভাষিকা। নতুন বিয়ে হয়েছে। কিন্তু চাকুরীর সুবাদে দু'জনকে দু'জায়গায় থাকতে হয়। প্রভাষিকা কুরআনের দাওয়াত পেলেন, নিজের ভুল বুঝতে পারলেন, অনুতপ্ত হলেন মনে-প্রাণে। আগে তিনি নামায-রোজা করতেন ঠিকই কিন্তু পর্দা করতেন না। এবার তিনি কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক পর্দা করতে শুরু করলেন। নামাযে যে গাফেলতিটুকু ছিল তাও

শুধরে নিলেন। ইতিমধ্যেই আসলেন তার কর্তা পুরুষটি। তিনিও উচ্চ শিক্ষিত। কলেজ যাওয়ার সময় স্ত্রীকে হিযাব পরতে দেখে চমকে উঠলেন। 'এ কি? কি পরেছ তুমি?' স্ত্রী মিষ্টি হেসে জানালেন, 'আমি এখন পর্দা করে বাইরে যাই।'
'কেন?' ভ্রূ কুঁচকে জানতে চাইলেন ভদ্রলোক।
স্ত্রী হিযাব পরতে পরতে বলেলন, 'আমি না মুসলমান? মহান আল্লাহর নির্দেশ মুসলিম নারী যেন বাড়ির বাইরে গেলে....।' কথা শেষ করতে না দিয়েই ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠল, 'চুপ! একদম চুপ। একটা শিক্ষিতা মেয়ে হয়ে মান্ধাতার আমলের কথা বলতে তোমার লজ্জা করল না?'
স্ত্রীও স্পষ্ট ভাষায় জানালেন, 'এটা মান্ধাতার আমলের কথা নয়, এ হচ্ছে কোরানের কথা। এ বিধান মানতে তো আমরা বাধ্য।' বলে চলে গেলেন কলেজে। বিকেলে আবার এই নিয়ে ঝামেলা বেঁধে গেল। স্বামী বেড়াতে যাবেন তার এক বন্ধুর বাসায়। স্ত্রীকে তৈরি হতে বললেন। স্ত্রী সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে যেই হিযাব পরতে গেলেন তখনই স্বামী সাহেব ক্ষেপে উঠলেন, 'ঐ জুব্বা পরে তুমি আমার সাথে যাবে? অসম্ভব আমি কিছুতেই তোমাকে সাথে নেব না।' বলে রাগ করে একাই চলে গেলেন। ফিরলেন অনেক রাতে। রাগ করে সারা রাত কথা বলেলন না। পরদিন নাস্তা করতে বসে বলেলন, 'শোন, তোমার সাথে একটা বোঝা-পড়ার দরকার আছে।' জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালেন মহিলা। ভদ্রলোক এবার বলেলন, 'তোমাকে একটা জিনিস বেছে নিতে হবে। হয় তুমি জুব্বা ছাড়বে না হয় আমাকে ছাড়বে।' বিকেল বেলা মহিলা আসলেন আমার কাছে। আমাকে সব খুলে বললেন। আমি বললাম, 'আপনি কোন্‌টা ছাড়তে চান?' মহিলা দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'আমি একটাও ছাড়ব না'। আমি বললাম, 'ব্যস! এবার আপনি আপনার সিদ্ধান্তের ওপর অটল থাকবেন। এ তো আল্লাহ পাকের তরফ থেকে একটা ছোট্ট পরীক্ষামাত্র। দেখবেন মহান আল্লাহ আপনার স্বামীকে নমনীয় করে দেবেন। এই পরীক্ষা কি উম্মে সুলাইমের মত পরীক্ষা নয়? হ্যাঁ, সে সম্ভ্রান্ত মহিলার কর্তা পুরুষটি নমনীয় হয়েছেন। তিনি আজও তার সিদ্ধান্তে অটল আছেন। এমনি পুরুষদের বিরোধিতার অনেক উদাহরণ আমার কাছে আছে। কিন্তু স্বামী হিসাবে তারই তো দায়িত্ব ছিল তার স্ত্রীকে পর্দায় রাখার। রসূল স. বলেন, 'দাউস কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' লোকেরা জিজ্ঞেস করল, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! দাউস কে? রসূল স. বললেন, 'দাউস ঐ পুরুষ যে তার স্ত্রী ও কন্যাকে পর্দায় রাখে না।' তাহলে আমাদের সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায় ৯৫% পুরুষ দাউস।

ইসলামী সমাজ তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থা না থাকা

নারীদের এই দুর্গতির সর্বশ্রেষ্ঠ যে কারণ, তা হলো ইসলামী সমাজ তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থা না থাকা। মহান আল্লাহ কুরআনে অসংখ্যবার বলেছেন, 'তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখ।' কিন্তু ইচ্ছে করলেই কাউকে আদেশ বা নিষেধ করা যায় না। বড় জোর অনুরোধ করা যায়, অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন,

সৎ কাজের আদেশ করতে আর অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখতে। এই আদেশ করা ও বিরত রাখার দায়িত্ব পালন করতে হলে ক্ষমতা থাকতে হবে।

কোন এক নদীর পাড়ে সুন্দর সুজলা সুফলা একটি গ্রাম। গ্রামের নারী-পুরুষ সবাই নদীতে গোসল করে। কোন মহিলা ভেজা কাপড়ে অর্ধ উলংগ অবস্থায় বাড়ি আসে। আবার কোন কোন মহিলা নদীর ঘাটেই শাড়ি পাল্টায়। সে তো আরো নির্লজ্জ ব্যাপার! একদিন কয়েকজন মহিলাকে বললাম, 'ভাবী, নদীর ঘাটে গোসল না করলে হয় না। কত বড় বেপর্দা হয় ভেবে দেখেছেন?' ভাবীরা আমার ওপর ক্ষেপে উঠলেন, 'শহরে থাকো তো টের পাও না। চাবি ঘুরালেই পানি পাও। নদীতে গোসল করব নাতো কি করব? ঠিক আছে আমাদের সবার বাড়িতে কল বসিয়ে দাও, করব না আর নদীতে গোসল।' আমি চুপ হয়ে গেলাম। অন্য মহিলারা আমাকে জব্দ করতে পেরে খুশীতে খিল খিল করে হেসে উঠল। গ্রামের মোড়ল দবীরুদ্দীন ভাইয়ের বাড়িতে এলাম। আমাকে দেখে ভাবী খুবই খুশী হলেন। বসতে দিয়ে বললেন, 'তুমি এলে খুব ভাল লাগে বোন! দু'চারটে হাদীস-কুরআনের কথা শোনা যায়।'

বললাম, 'হাদীস-কুরআনের কথাই বলতে এসেছি ভাবী। ভাইকে ডাকেন, ভাইয়ের সামনে বলব।' দবীর ভাই পঞ্চান্ন থেকে ষাটের মধ্যে বয়স। বেশ শক্ত সমর্থ চেহারা। নিষ্ঠার সাথে ইসলামের আইন-কানুন মানার চেষ্টা করেন। বললাম, 'ভাই, আপনি কি এ হাদীসটি পড়েছেন, 'প্রত্যেক মানুষই দায়িত্বশীল, প্রত্যেককে তাদের অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে।' ভাই মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, পড়েছি।'

আমি বললাম, 'তাহলে এই গ্রামের সবাই আপনাকে মাতব্বর হিসাবে মানে। সম্মান করে, ভয় পায়। আপনি কি দেখেছেন গ্রামের মহিলারা সবাই বেপর্দা হয়ে নদীতে গোসল করে, অথচ আপনি তাদের কিছু বলেন না? ওদের এই গুনাহের ভাগ কিন্তু আপনার আমলনামায়ও লেখা হবে ভাই। আপনি অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার আদেশ দিচ্ছেন না। এটুকু কিন্তু আপনার আয়ত্তের মধ্যে।' এর কয়েক দিন পর আমি আবার ঐ পাড়ায় বেড়াতে গেলাম। গিয়ে দেখি মেয়েরা সবাই বাড়িতেই গোসল করে। 'কি ব্যাপার নদীতে আর যান না?' প্রশ্ন করতেই উত্তর পেলাম, 'আমাদের মাতব্বর সাহেবের হুকুম, মেয়েরা আর কেউ নদীতে যেতে পারবে না।' খোঁজ নিয়ে জানলাম কারো স্বামী কাজে যাওয়ার আগে গোসলের পানি দিয়ে যায়। কারো ছেলে পানি আনে। কেউ রাতের বেলা নিজেই পানি নিয়ে আসে। কয়েক বাড়িতে দেখলাম, টিউবওয়েল বসানোর কাজ চলছে।

প্রথমে আমি যখন মহিলাদের নদীতে গোসল করতে নিষেধ করেছিলাম তখন তারা আমার কথার কোনো দামই দেয়নি। কারণ আমার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু মাতব্বর সাহেব যখন বললেন তখন তার কথার বিরোধিতা কেউ করেনি। কারণ তার পাওয়ার আছে। তেমনি সমাজের ও রাষ্ট্রের নেতৃবর্গ যদি ইসলাম বুঝত তাহলে সমাজ থেকে তথা রাষ্ট্র থেকে অনৈসলামী কার্যকলাপ বন্ধ হতো। মানুষ ইসলামকে জানার বোঝার পরিবেশ পেত, ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্তি দূর হতো। কিন্তু তাই বলে এ কথা ভেবে বসে

থাকলে চলবে না যে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ভাল না, আমাদের পুরুষেরা আমাদের বাধা দেয়, আমাদের ইসলামী রাষ্ট্র নেই— এই সব অজুহাত দেখিয়ে তো আল্লাহর কাছে রেহাই পাওয়া যাবে না। আমাদেরও কিছু ক্ষমতা আছে, গুণ আছে, ব্যক্তিত্ব আছে। আমাদের প্রধান ক্ষমতা আমরা পুরুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারি। মহান আল্লাহ যাকে যতটুকু ক্ষমতা দিয়েছেন তার কাছ থেকে ততটুকুর হিসাবই নেবেন।

শেষ কথা

সম্মানিতা মা-বোনেরা, সবচেয়ে বড় কথা আর সবচেয়ে সত্যি কথা হলো মরতে হবেই। এর কোন বিকল্প নেই। মহান আল্লাহর দরবারে হাজির হতেই হবে। মহান আল্লাহর দেয়া প্রতিটি নেয়ামত ও আমাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের হিসাব দিতে হবে সেই ন্যায় বিচারক আল্লাহর কাছে। রসূল স. বলেছেন, পাঁচটি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আদম সন্তানকে এক পাও নড়তে দেওয়া হবে না।

১.জীবনটা কোন্ কাজে অতিবাহিত করেছ, ২. যৌবন কালটা কি কাজে ব্যয় করেছ, ৩. কোন্ পথে আয় করেছ, ৪. কোন্ পথে ব্যয় করেছ, ৫. তোমাকে দেয়া নেয়ামতগুলোর হক কিভাবে আদায় করেছ? উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর নারী-পুরুষ উভয়কেই দিতে হবে।

আর তাই তো মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন, 'পুরুষ যা অর্জন করেছে সে তাই পাবে আর নারী যা অর্জন করেছে সেও তাই পাবে (সূরা নিসা-৩২)।' তাই মুসলিম নারী সমাজের কাছে আমার দাওয়াত, আসুন, আমরা ইসলামের জন্য, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তির জন্য— রসূল স.-এর যুগে ও পরবর্তী যুগে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ হযরত ওমর রা. হযরত ইকরামা রা. হযরত আদী-ইবনে হাতেম তাঈ রা. হযরত আবু তালহা রা.— এমনি আরও অনেক বিখ্যাত সাহাবীদের আমরা এক নামে চিনি, কিন্তু জানি না তাঁরা প্রত্যেকেই নারীদের দাওয়াতে মুসলমান হয়েছেন। আমরা তো সেই নারীদেরই উত্তরসূরি। অশিক্ষা আর কুশিক্ষার জঞ্জালে চাপা পড়ে আছে আমাদের পরিচয়।

অন্য নবী-রসূলদের যুগে, রসূল স.-এর যুগে ও পরবর্তী যুগে নারীরা যেভাবে কাজ করে গেছেন জান ও মাল দিয়ে, আমরাও সেভাবে দাওয়াতী দ্বীনের কাজকে, ইকামতে দ্বীনের কাজকে আরও বেগবান করি। আমরাও ফাতেমা বিনতে খাত্তাব, উম্মে হাকাম, সাফনাহ বিনতে হাতেম তাই, উম্মে সুলাইমের মতো স্বামী-সন্তান ও ভাইদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিই। আমাদের সমাজের নারী-পুরুষেরা এসব দায়ীইল্লাল্লাহ নারীদের নামই হয়ত জানে না। আসুন, আমরা এই মহিয়সী নারীদের নাম ও কর্মকাণ্ড মুসলিম মিল্লাতের সামনে তুলে ধরি। আমরা প্রকৃত দায়ীইল্লাল্লাহ হিসাবে যেন আল্লাহ পাকের সামনে হাজির হতে পারি। মানুষ শয়তান ও জ্বীন শয়তানের হাত থেকে মহান আল্লাহ যেনো আমাদের রক্ষা করেন! ইবলিশের সর্বপ্রকার ধোঁকা থেকে যেন নিজেদেরকে হেফাজত করতে পারি। আমিন! ছুম্মা আমিন।

প্রসঙ্গ কথা

ইসলামের সোনালী যুগের শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও চিন্তা-চেতনা থেকে বর্তমানে আমরা অনেক দূরে সরে এসেছি। ইসলামের যে শিক্ষা জাতির প্রত্যেক সদস্যকে কল্যাণ ও মহৎ কাজের দিকে অনুপ্রাণিত করে সে দর্শন ভুলে গেছি আমরা। তার ফলে কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ-প্রক্রিয়া নীতিতে নারী-পুরুষের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রতিভা বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসলে নারী ও পুরুষ পরস্পরের সম্পূরক। কেউ একা পরিপূর্ণ নয়। উন্নয়ন কাজে সফলতা লাভ কারো পক্ষে একা সম্ভব নয়। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে উভয়ের অবস্থান পাশাপাশি।

মানব সভ্যতার উষা লগ্ন থেকে সকল কাজে পুরুষের সাথে নারীর হাত সমান তালে চলেছে। যুগে যুগে সংগ্রাম, সংঘাতে ও ইসলাম প্রচার-প্রসারের কাজে নারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তাদের ত্যাগ ও সাধনায় কখনো রচিত হয়েছে নতুন যুগ, নতুন জাতি ও নতুন ইতিহাস। মোঘল জাতি ও মোঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস তার একটি উজ্জ্বল প্রমাণ।

আমাদের সামনে নারীদের সেই ত্যাগ, সাধনা ও মহতী কর্মের গৌরবময় ইতিহাস লেখা নেই বললেই চলে। কেউ এ বিষয়টির দিকে গুরুত্ব দেননি। চিন্তাশীল লেখিকা মাসুদা সুলতানা রুমী ইসলামের প্রচার-প্রসার কাজে যুগে যুগে মহিলাদের সেই অসামান্য ত্যাগ ও অবদানের গৌরবদীপ্ত কাহিনীর কিছুটা হলেও 'যুগে যুগে দাওয়াতী দ্বীনের কাজে মহিলাদের অবদান' পুস্তিকায় তুলে ধরেছেন। এ পুস্তিকা পাঠে বর্তমান সমাজের মহিলারা তাদের পূর্বসূরীদের ত্যাগ ও সাধনার কথা যেমন জানতে পারবেন, তেমনি ইসলামের প্রচার-প্রসার কাজের আন্দোলনে শরীক হওয়ার উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করবেন বলে আশা করা যায়। মাসুদা সুলতানা রুমীর এ মহতী উদ্যোগ নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবী রাখে। আগামীতে আমরা তাঁর হাত থেকে এরূপ আরো পূর্ণাংগ লেখা আশা করি।

ISBN-984-817-017-0
0 009848 170173